খেলা যখন

বুদ্ধদেব গুহ

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৬১
অগ্রহায়ণ : ১৩৬৮

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ. গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

খেলার সাথীকে

খেলা যখন

গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থেকে নামতেই দেখলাম সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। কারণ, রিহার্সাল শুরু হয়ে যাবার কথা ঠিক সাড়ে ছ'টায়। মোড় থেকে হেঁটে যেতে ভীড় ঠেলে অন্তত মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে।

খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে সত্যিই খুব রাগ হয়। গানের স্কুলে গান শিখব, তাতেও এত কড়াকড়ির কোনো মানে হয়?

সুনীলদার তত্ত্বাবধানে রিহার্সাল।

তাড়াতাড়ি হুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই দেখলাম রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে।

ঘরে বাইরে চটির সমুদ্র। কোনো রকমে তা পার হয়ে চোর-চোর মুখ করে ছেলেদের ঠেলেঠুলে এক কোণায় বসে পড়লাম।

একপাশে ছেলেরা বসেছিল, অন্যপাশে মেয়েরা।

সুনীলদা গাইতে গাইতেই চোখ দিয়ে একবার আমাকে চাবুক মেরে আস্থায়ী শুরু করলেন, "বাজাও তুমি কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর, দ্রব জীবন ঝরিবে ঝরঝর নির্ঝর তব পায়ে।"

গানটার ধরা ছাড়া ও ছোঁড়ার কাজ রীতিমত কঠিন।

মনোযোগ দিয়ে সুনীলদার গান শুনতে লাগলাম। সুনীলদার গলা একেবারে সুরে বসানো। বড় নির্দ্বিধায় শুদ্ধ ও কোমল পর্দা ছমছম করে ছুঁয়ে যান উনি।

সুনীলদা অন্তরা ধরেছেন, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল তার দিকে।

তাকে এর আগে আমি কখনও দেখিনি। কিংবা হয়ত দেখেছি, লক্ষ্য করিনি। না, বোধহয় দেখিইনি। দু'দিকে দুই বিনুনী ঝুলিয়ে একটি বাসন্তী-রঙা শাড়ি পরে দু'কানে দু'টি রক্তরুবির দুল পরে সে

বসেছিল।

কপালের উপরে যেখানে চুল শুরু হয়েছে সেখানে একটি কাটা দাগ।

মুখ নীচু করে সে বসেছিল আসন কেটে। তার বসার ভঙ্গীর মধ্যে, তার চোখের উদাসীনতার মধ্যে কি যেন কী ছিল, যা আমাকে হঠাৎ চমকে দিল। এমনভাবে আর কোনো কিছু দেখেই আমি এর আগে চমকাইনি।

তার চারপাশের এই ঘনসন্নিবিষ্ট ছেলেমেয়েদের ভীড়ে তাকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভাল করে চাইতেই বুঝতে পেলাম, সব কিছু মিলিয়ে তার সমর্পণী উদাসীন ছিপছিপে অস্তিত্বে কোনো এক আশ্চর্য অসাধারণত্ব এলেবেলে অবহেলায় আরোপিত হয়ে ছিল।

আমার বুকের মধ্যে যেন কি রকম করছিল।

চোখ নামিয়ে সকলের সঙ্গে কোরাস গাইছিলাম।

কিছুক্ষণ পর সুনীলদা হঠাৎ গান বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে বললেন, কে? কে? কোন্‌জন?

আমরা সকলেই চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম।

উনি তর্জনী তুলে আমারই দিকে দেখিয়ে বললেন, তুমি, তুমি। তুমিও? একেবারে 'ইউ টু ব্রুটাস'-এর মত।

আমি তখন অন্য জগতে অবস্থান করছিলাম।

অবাক হয়ে শুধোলাম, কি?

সুনীলদা বললেন, কি-ই যদি বুঝবে, তাহলে তো দুঃখই ছিল না।

বেসুরো হচ্ছে। বেশ বেসুরো। মন দিয়ে খোঁজখাঁজগুলো তুলো। বুঝলে, রাজা।

মুখ নীচু করে রইলাম। কর্ণমূল গণ্ডমূল সব লাল হয়ে গেল। ঘরভর্তি ছেলেমেয়েদের সামনে কী বে-ইজ্জৎ!

আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে হাসছে না।

বটে, কিন্তু তার পুরীয়া-ধানেশ্রী চোখে একটা দারুণ দুষ্টু হাসি স্থির হয়ে আছে।

"বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত" এই গানের পর একে একে কোরাসের আরো অনেক গান তোলা হলো। দু-একটা ডুয়েটও ছিল।

এমন সময় সুনীলদা তার দিকে চেয়ে বললেন, ধর খুকী।

সুনীলদা হারমোনিয়ম বাজালেন। সেই খুকী শুরু করল, "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন।"

গানটা শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার মন বলতে লাগল, এমন গান আমি আর আগে শুনিনি। তার অল্পবয়সী চিকন গলার স্বরে কি যেন কি ছিল। জলতরঙ্গের মত, ভোরের পাখির ডাকের মত, বুকের মধ্যের নিঃশব্দ অথচ স্পষ্ট কান্নার মত। আমার মনের মধ্যে এতদিন যত কিছু অধন্য ছিল, অধন্য থাকত চিরদিন—সেই সবকিছুকে তার গান ধন্য করে তুলল।

যতক্ষণ না গান শেষ হয়, আমি মুখ নীচু করে মোহাবিষ্টর মত গানটা শুনছিলাম। গান শেষ হতেই মুখ তুলে তার দিকে চাইলাম।

সে সংকোচহীন সরল চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কিন্তু আমার চোখে মুখে একটা বিরক্তি ফুটে উঠল।

পরক্ষণেই সে মুখ নামিয়ে নিল।

রিহার্সাল শেষ হলো। আমিও প্রায় শেষ হয়ে গেলাম। অথবা শুরু হলাম। বুঝতে পারলাম না।

সকলে একে একে চলে-গেল।

সুনীলদা নিচে গিয়ে মুরারীর বানানো চারটে ডিমের এক মস্ত বড় ওমলেট খেতে লাগলেন। সুনীলদা ডিম খেতে খুব ভালবাসতেন।

কিন্তু আমি তখনও বসেই রইলাম। একা-একা।

অনেকক্ষণ পর যখন সিঁড়ি বেয়ে চলে যাচ্ছি নেমে, সুনীলদা দেখতে পেয়ে বললেন, কি হে? রাগ হয়েছে না কি?

আমি হাসলাম; বললাম, না। না।

মনে মনে বললাম, হয়েছে বিলক্ষণ। তবে আপনার উপর নয়।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে অনেকক্ষণ আয়নার সামনে বসে নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলাম। আমার মুখে কোনো সৌন্দর্য ছিল না, কিন্তু আমার চোখে চোখ পড়লে কেউ বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবে এমন কোনো কদর্যতা বা বৈকল্যও দেখতে পেলাম না আয়নায়।

সেদিন রাতে ভাল ঘুমোতেই পারলাম না।

তার গান শুনলাম এই-ই মাত্র। সে কে! তার বাবার নাম কি? সে কোথায় থাকে, কিছুই জানা হলো না।

যদি জানতেও পেতাম যে, সে কে!

পরদিন অফিসে গিয়েই নড়িদাকে ফোন করলাম। মানে ফোন না করে পারলাম না।

নড়িদা আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। ভাল গান গাইত। সব সময় ফিটফাট ফুলবাবুটি। আমরা গানের স্কুলে একই ক্লাসে ছিলাম। নড়িদা আমাকে খুব স্নেহ করত।

নড়িদাকে শুধোলাম, নড়িদা, কাল 'জগতে আনন্দযজ্ঞে' গাইল সে মেয়েটি কে? জানো?

নড়িদা বলল, কেন? সে গান শুনে তোমার এত নিরানন্দ কেন?

আমি বললাম, বলো না কে?

নড়িদা হাসল।

বলল, আলাপ করার অসুবিধা নেই। ওদের বাড়িতে চলে যেতে পারো। ওরা খুব উদার। খুব ভাল পরিবার।

আমি বললাম, মহা মুশকিল তোমাকে নিয়ে, বাড়িটা কোথায় তাই বলো না ? ওর নাম কি ? ওর বাবার নাম কি ?

নড়িদা ফোনে খুব হাসতে লাগল। বলল, তোমার অবস্থা খুব খারাপ দেখছি।

আমি বললাম, প্লিজ বলো।

নড়িদা বলল, ওর নাম বুলবুলি। ওর বাবাকে তুমি দেখেছ।

আমি অবাক হলাম ; বললাম, কোথায় ?

নড়িদা বলল, আমাদের স্কুলের গৃহপ্রবেশের দিন সকালবেলা এসেছিলেন, মনে আছে ? একটা কালো ফিয়াট গাড়ি থেকে নামলেন, হাওয়াই শার্ট পরা, হাতে স্টেট-এক্সপ্রেসের টিন। বিজুদা গিয়ে হাত ধরে নিয়ে এলেন। মনে আছে ? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এ ভদ্রলোক কে ? মনে নেই ? বুলবুলি ওঁর মেয়ে, রূপের বোন এবং বিজুদার ভাইঝি।

আমি বললাম, সর্বনাশ।

নড়িদা খুব হাসতে লাগল, বলল, কেন ? সর্বনাশ কেন ?

আমি বললাম, না। কিছু না।

বলেই, ফোন ছেড়ে দিলাম।

বিজুদার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই আমার ভয় করে। বোধ হয় অনেকেরই করে। যদিও তিনি আমার জ্যাঠামশাই নন, আমার অ্যাকাউন্ট্যান্সীর প্রফেসর সাহা সাহেবও নন, নেহাত শখ করে যেখানে গান শিখতে যাই, তিনি সেখানের সর্বেসর্বা।

ভয় পাবার কোনো সঙ্গত কারণও নেই। কিন্তু কেন জানি না, ভীষণ ভয় হয়, কারণ না থাকলেও ভয় করে।

সে যে বিজুদার ভাইঝি, এ-কথা শুনেই মনে মনে ঠাণ্ডা মেরে একেবারে কুঁকড়ে গেলাম। আমি নির্ভয়ে বাঘের সামনে দাঁড়াতে পারি, কিন্তু বিজুদার ভাইঝিকে ভালো-লাগার মত দুর্বিপাকে যেন আমাকে কখনও না পড়তে হয়, মনে মনে এই কথাই বার বার নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম।

রূপদাকে আমি চিনতাম। মানে, জাস্ট চিনতাম। এই পর্যন্তই। চেহারাটা দারুণ ছিল। আর্টিস্ট। ভাল গান করতেন। অভিনয়ও ভাল করতেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় প্রত্যেকবার বাল্মীকি হতেন। স্টেজে যখন তিনি মেক-আপ নিয়ে বাল্মীকির সাজে খড়্গহাতে দাঁড়াতেন, যখন উইংস্ থেকে তার কাটা-কাটা শার্প মুখে রঙীন আলো এসে পড়ত, আর উনি গাইতেন,

"রাঙাপদযুগে প্রণমি গো ভবতারা,
আজি এ নিশীথে পূজিব তোমারে তারা"

তখন রূপদার প্রতি এক দারুণ স্তুতিতে আমার সমস্ত ছেলেমানুষী মন ভরে যেত।

তাই তাঁর বোন সে, একথা শুনে খুব ভাল লাগল।

সবই ভাল। একমাত্র অসুবিধা বিজুদা! বিজুদার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসত।

মনে আছে, দূর থেকে এক ভদ্রলোক গান শিখতে আসতেন। উনি আমাদের ক্লাসেই ছিলেন।

ভদ্রলোক পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, সেলুনে চুল-টুল কেটে, ঘাড়ে খুব করে সুগন্ধি পাউডার মেখে একদিন ক্লাসে এলেন।

ক্লাশের পর বিজুদা বললেন, দেখুন এটা একটা শিক্ষায়তন। এখানে এভাবে আসবেন না।

তিনি বললেন, তার মানে? আমি কি পয়সা দিয়ে গান শিখি না? আমি এখানে গান শিখতে আসি, আর কিছু করতে নয়। তাছাড়া আপনি কি আমার লোকাল গার্জেন না আমি কিণ্ডারগার্টেনের শিশু যে, আমি কি পরে আসব না আসব তা আপনি বলে দেবেন?

বিজুদা বললেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। এরকম-ভাবে পায়জামা পরে এলে আপনাকে গান শেখানো হবে না। আপনাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হবে।

তিনি বললেন, কোলকাতায় কি গানের স্কুলের অভাব?

ছেড়ে দিলে আমার কোনোই ক্ষতি নেই ; ক্ষতি আপনার, আমার মাইনেটা স্কুলে জমা হবে না।

বিজুদা বললেন, শুধু মাইনের বিনিময়ে আমরা কাউকে গান শেখাই না। আপনাব মত ছাত্রব জন্যে এ স্কুল নয়। আপনার এ মাসের মাইনেও ফেরত নিয়ে যাবেন। আপনি আর আসবেন না।

এ ঘটনা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল।

অনেকেই বলেছিল যে, এটা বাড়াবাড়ি।

আজ বিজুদা নিজেই সব সময় পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেন, কিন্তু যখনি পিছন ফিরে চাই, তখনই মনে হয়, সে ঘটনাটা একটা নিছক পায়জামাঘটিত সামান্য ঘটনা ছিল না।

সেই গানের স্কুলের মিলিটারী নিয়মানুবর্তিতা, গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি, এ সবের কথা এখন মনে পড়লে বার বার মনে হয় যে, বিজুদার মত দু'চার জন লোক আমাদেব শিক্ষাক্ষেত্রে থাকলে দেশেব ছেলেমেয়েদের বোধহয় ভাল ছাড়া খারাপ হতো না।

বিজুদাকে ভয় করতাম, সব সময় একটা দূরত্ব রেখে চলতাম। কিন্তু আমার ভীষণ ভাল লাগত বিজুদার স্ত্রীকে।

উনি আমাদের সকলেরই বৌদি ছিলেন। উনি যখন গরমের দিনে গা ধুয়ে ছাপা শাড়ি পরে বিকেলে স্কুলে ঢুকতেন, তখন কেন জানি না, ভালো-লাগায় মন ভরে যেত।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি আজ পর্যন্ত ওঁর চেয়ে বেশী রমণী-সুলভতা কোনো রমণীর মধ্যে দেখিনি।

ওঁর চেহারা, কথা বলা, গান-গাওয়া সব মিলিয়ে উনি যখনই আমাদের মধ্যে থাকতেন কোনো ব্লক-প্রোগ্রামের মহড়ায় বা সরস্বতী পুজোয় দুপুরের খিচুড়ির আসরে, ওঁর নরম মেয়েলি ব্যক্তিত্ব আমাদের সকলকেই এক দারুণ ভালো-লাগায় ভরিয়ে দিত।

যে-ক'দিন সমাবর্তন উৎসবের মহড়া চলল ততদিন আমার সেই গায়িকাকে রোজই দেখতে পেতাম ; কিন্তু এক মহড়া এবং

অন্য মহড়ার মধ্যের ঘটনাবিহীন দিনগুলোতে ওকে একবার দেখবার জন্যে ভীষণ ছটফট করতাম।

অথচ দেখার উপায় ছিল না।

আমি এমন সপ্রতিভ ছিলাম না যে, সটান রূপদাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই। উপস্থিত হলেও ব্যাপারটা বোকা বোকাই হতো। ওর বাবার সঙ্গেই হয়তো দেখা হয়ে যেত। অথবা রূপদার সঙ্গে।

রূপদা বলতেন, কি ব্যাপার? তুমি? হঠাৎ?

আমি বলতাম, এই কাছেই এসেছিলাম, তাই ভাবলাম ঘুরে যাই।

রূপদা বলতেন, আমি যে এক্ষুনি অফিসে বেরুচ্ছি। আর একদিন এসো, কেমন? ছুটির দিনে।

আমি বলতাম, আচ্ছা।

তারপর নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে, নিজেকে অভিশাপ দিতে দিতে হয়তো বাড়ি ফিরে আসতাম।

তার চেয়ে এই-ই ভাল।

অনেকদিন পর পর তাকে একবার দেখা। তারপর না-দেখার দিনগুলোতে তার কথা ভেবে কাটানো।

তাছাড়া অন্য মুশকিলও অনেক ছিল।

যেদিন গানের স্কুলে ভর্তি হলাম, মা বললেন, দেখিস, তুই যা কাবলা, আবার প্রেমে-টেমে পড়িস না যেন। তোর নামে যেন কারো চিঠি-টিঠি না আসে; ফোন টোনও যেন কেউ না করে।

এ-রকম অনেক প্রি-কণ্ডিশান শিরোধার্য করে আমি গান শিখতে গেছিলাম। যদিও ছেলেদের ক্লাস ও মেয়েদের ক্লাস আলাদা আলাদা হতো।

আমাদের বাড়িতে প্রেম ব্যাপারটা কুষ্ঠরোগের চেয়েও ভয়াবহ ছিল।

বাবা এসব ব্যাপারে কোনো আলোচনা কখনও করতেন না,

তবে বাবা একবার নিরুৎসাহব্যঞ্জক চোখে তাকালেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত।

যা-কিছুই বলবার আমাদের, মা-ই বলতেন, বাবার নাম করে। তার মধ্যে বাবার বক্তব্য কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে বাবার নিজের স্বার্থেই তদন্ত হওয়া উচিত ছিল।

কিছু হলেই, অথবা মা'র মনঃপূত নয় এমন কিছু হব-হব হলেই মা বলতেন, বাবা জানলে আর রক্ষা রাখবেন না।

সেই অরক্ষিত অবস্থাটার প্রকৃত স্বরূপ যে কি, সে সম্বন্ধে আমার অথবা ভাই-বোনেদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না; তবে সেটা গিলোটিনের চেয়ে যে কিছুমাত্র ভাল নয়, সে সম্বন্ধেও আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

সুতরাং, একজনকে ভালো-লাগার আনন্দটাকে গিলোটিনের ভয় সব সময় ব্লটিং পেপারের কালির মত শুষে নিত।

দেখতে দেখতে আমাদের সমাবর্তন উৎসব এসে গেল।

আশুতোষ কলেজের হলে সময়মত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আমরা সকলে উপস্থিত হলাম। মেয়েরা সবাই সাদা জমি সবুজ পাড়ের শাড়ি পরে এসেছিল।

সেদিন আর কে কে গেয়েছিলেন ভাল মনে নেই। তবে তড়িৎদা গেয়েছিলেন, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম, চোখের বাহিরে'। গানটা এখনও কানে লেগে আছে।

রূপদা যেন কার সঙ্গে ডুয়েট গেয়েছিলেন, বোধহয় ইলা সেনের সঙ্গে, 'আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ।'

তারপর গেয়েছিল সে।

আমি যদিও শুধু কোরাসেই ছিলাম সেবার (এবং সারা জীবন তাই-ই থাকবো জানতাম) তবুও আমাকে বসতে বলা হয়েছিল প্রথম সারিতে অন্য অনেকের সঙ্গে। রূপদা, তড়িৎদা সব প্রথম সারিতেই বসেছিলেন।

তার গাইবার পালা যখন এল, তখন সে মেয়েদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল লঘু পায়ে, এসে তার ছিপছিপে সুগন্ধি শরীরে আমাদের পাশে এসে বসল।

তাকে আমার এত কাছে বসতে দেখেই, আমার ভারী আনন্দ হচ্ছিল।

সেই গানটিই গাইল সে—একক—'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।'

গানের রেশ শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে থাকল, এবং ওর গান যে সকলকে মুগ্ধ করল, এই জানাটা আমাকে এক দারুণ অনধিকারীর গর্বে গর্বিত করে তুলল।

ও গান গেয়ে উঠে পিছনে যাবার সময় আমার হাঁটুর সঙ্গে ওর পা লেগে গেল।

অনেকক্ষণ আমি আর হাঁটু নাড়ালাম না একটুও—যেমন আসন করে বসেছিলাম, তেমন পদ্মাসনেই বসে রইলাম। আমার সমস্ত শরীর ও মন এক প্রসাদী পদ্মগন্ধে সুরভিত হয়ে গেল।

তড়িৎদা ফিসফিসে গলায় রূপদাকে বললেন কানের কাছে মুখ নিয়ে, ভারী ভাল গেয়েছে বুলবুলি।

আমি তড়িৎদার কথা রিপিট্ করে রূপদাকে বললাম, দারুণ গেয়েছে। তাই না?

রূপদা আমার দিকে মোটর-সাইকেলে চড়া লোক যেমন সন্দেহের চোখে পথের কুকুরের দিকে তাকান, তেমন চোখে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, বলছ?

আমি সপ্রতিভতার ভান করে অপ্রতিভতাকে চাপা দিলাম, বললাম, বলছি।

মনে মনে রূপদার উপরে বেশ চটে গেলাম।

কিন্তু কি করব? বুলবুলির দাদার উপরে কি আমি রাগ করতে পারি?

সেই সন্ধ্যায় ওকে কিছুক্ষণ কাছে পাবার সুখটুকুকে, উৎসব

শেষে ওকে আর দেখতে পাবো না, এই ভাবনায় দুঃখটা একেবারে ছেয়ে ফেলল।

সেদিন আশুতোষ কলেজ থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন সুখের বা দুঃখের জন্যে জানি না, মনের মধ্যে একটা ভীষণ ভার অনুভব করতে লাগলাম।

এর আগে কখনও আর আমাকে এমন সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক পাতা ডাইরী লিখলাম সেদিন।

তারপব "তোমাকে" এই শিরোনামায় একটা কবিতা লেখার উচ্চাশার নাগরদোলায় চেপে অবশেষে অনেক পাতা ছিঁড়ে, কলম কামড়ে রাত দুটো নাগাদ সেই কবিতাকে ঘুম পাড়িয়ে, নিজেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ২ ॥

অফিস থেকে ফিরেই বাবা ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ঘরে।

বাবার ডাকের দুটো মানে হতো। এক হয়তো কলম বা কোনো কিছু উপহার এনেছেন—সেজন্যে, নইলে কোনো অন্যায়ের শাসন করার জন্যে।

যখন সজ্ঞানে কোনো অন্যায় করতাম, তখন ডাক আসলেই বুঝতে পারতাম। যখন অজ্ঞানে করতাম তখন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবতাম, কি কি অন্যায় আমি অজ্ঞানে করে ফেলতে পারি!

সেদিন ঘরে ঢোকার আগেই শুনতে পেলাম, বাবা ও মা দু'জনে একসঙ্গে খুব হাসাহাসি করছেন।

ঘরে ঢুকতেই মা বললেন, কি রে? তোর বাবা লোক কী রকম তা তুই পথে পথে যাচাই করে বেড়াচ্ছিস?

পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল।

এরকম সাংঘাতিক কথা হাসিমুখে মা বলছেন দেখে প্রথমে অবাক হলাম। তারপরই হেসে উঠলাম।

ব্যাপারটা সেদিনই ঘটেছিল। দু' নম্বর বাসের দোতলায় উঠেছি অফিস যাব বলে। জানালার পাশে সীট পেয়ে বসেও পড়েছি। এমন সময় দেখা রাঘবদার সঙ্গে। রাঘবদাকে 'রাঘবদা' বলেই জানতাম। তাঁর পদবী জানতাম না। তিনি ওকালতি করতেন কলকাতা হাইকোর্টে। আমাদের সঙ্গে ক্লাবে একসঙ্গে টেনিস খেলতেন। ক্লাবের দাদা।

আমার পাশের সীটটা খালি হতেই রাঘবদা এসে বসলেন। বললেন, সাত-সকালে অফিস-পাড়ায় কোথায় চললে—এই গরমে?

আমি বললাম, কেন? অফিসে!

অফিস কি হে? এরই মধ্যে অফিস? পড়াশুনা সব শেষ? গ্র্যাজুয়েশানের পর আর পড়লে না?

আমি বললাম, পড়ছি তো।, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সী পড়ছি যে। আর্টিকেল্ড ক্লার্কদের তো অফিস যেতে হয়।

রাঘবদা বললেন, ও আচ্ছা! বেশ! বেশ। কোন্ ফার্মে? ফার্মের নাম বললাম। বাবা সে ফার্মের একজন পার্টনার। ফার্মের নাম বলতেই রাঘবদা বললেন, কার আণ্ডারে সার্ভ করছ? বাবার নাম বলতেই উনি আবার বললেন, আরে তাই নাকি? উনি তো আমার ভীষণ চেনা। তুমি আগে বলবে তো! তাহলে তোমার সম্বন্ধে একটু বলে দিতাম। উনি আমাকে খুব ভাল চেনেন, এই সেদিনই তো আমাকে লিফট্ দিলেন।

তারপর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বললেন, ঠিক আছে। বলে দেবো।

আমি বললাম, কি বলবেন?

রাঘবদা বললেন, তোমার প্রতি যেন বিশেষ ইণ্টারেস্ট নেন। দেখবে, আমি বললে হয়তো অ্যালাউন্সও বাড়িয়ে দেবেন।

আমার খুব মজা লাগছিল। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, উনি লোক কেমন?

রাঘবদা বললেন, আরে, চমৎকার লোক। যদিও রাশভারী। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাশ লোক।

রাঘবদার কথা শেষ হতে না হতে চৌরঙ্গীর মোড় এসে গেল। আমি উঠে বললাম, চলি।

রাঘবদা বললেন, ওঁকে আমার নমস্কার দিও।

আমি নেমে যাবার সময় বললাম, উনি আমার বাবা হন।

বলতেই, রাঘবদা তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। রাগে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। বললেন, কী সাংঘাতিক! তুমি তো মানুষ খুন করতে পারো হে!

আমি ততক্ষণে নিচে নেমে গেছি।

উনি বাসের দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, তোমার মত ফাজিল ছেলে আমি দেখিনি। ওঁর সম্বন্ধে আমি যদি যা-তা বলে ফেলতাম ?

আমি হেসে বললাম—বলেননি তো। তাহলেই হলো।···

বাবা বললেন, আজ রাঘব এসেছিল সন্ধ্যের সময়, বার-ফেরত। এসেই বলল—দাদা, কী ডেঞ্জারাস্ ছেলে আপনার, বাজারে যাচাই করে বেড়াচ্ছে আপনি লোক কেমন ?

আমি মুখ নামিয়ে বাবাকে বললাম, উনি যে আমাকে কিছু বলতে দেবার সুযোগই দিলেন না আগে।

এ নিয়ে বাবা ও মা অনেকক্ষণ হাসাহাসি করলেন।

একটু পরে বাবা বললেন, তুমি থিয়েটার করছ না কি ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ভয়ে ভয়ে।

বাবা বললেন, থিয়েটার কবে ? কোথায় হবে ?

আমি বললাম, দেরী আছে। নিউ-এম্পায়ারে।

উনি বললেন, থিয়েটারই করো আর গানই গাও, পড়াশুনাটা ঠিকভাবে কোরো। রোজ সকালে দু' ঘণ্টা বিকেলে দু' ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে ঘড়ি সামনে রেখে অ্যাকাউণ্ট্যান্সীর অঙ্ক কোরো—নইলে পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টার মধ্যে অতগুলো ব্যালান্স শীট কখনও মেলাতে পারবে না।

আমি মাথা নেড়ে নিচে নিজের ঘরে চলে এলাম।

মাথা তো নাড়লাম, কিন্তু এই অ্যাকাউণ্ট্যান্সীর সঙ্গে আমার মোটে বনে না। যত টাকা-আনার হিসেব। ডান দিকের সঙ্গে বাঁ দিক মেলাও। হাতে মেসিন লাগিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পাটের মহাজনের মত অঙ্ক কষো।

ভাবতাম, অনেক গাধা মরে বাবার বড় ছেলে হয়, আর অনেক বড় ছেলে মরে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্সীর ছাত্র হয়। ভেবেছিলাম, আর্মিতে যাব, অথবা এয়ার-ফোর্সের পাইলট হব।

সেকেণ্ড প্রেফারেন্স ছিল শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করার। গাছতলায় বসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কাঁধে চাদর ফেলে ফুরফুরে হাওয়ায় অনেক বাধ্য ছাত্র ও সুন্দরী ছাত্রীদের নিয়ে মনের মত জ্ঞান দেওয়ার কথা তখন প্রায়ই ভাবতাম। তা না, পড়তে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট্যান্সী।

এ আমার লাইন নয়। যাদের লাইন, তাদের আমি শ্রদ্ধা করি, তাদের কোনো রকমে ছোট করে দেখি না। কিন্তু এ আমার জন্যে নয়। অথচ এ লাইন থেকে ডিরেইলড হব, এমন কোনো উপায়ই নেই।

আমার অ্যাকাউন্ট্যান্সী-পড়া বন্ধু সাবু শিলং গেল বেড়াতে। সেখানে গিয়ে কোথায় অমিত রায় আর লাবণ্যের কথা মনে পড়বে, কোথায় 'মোর লাগি কেউ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে' ইত্যাদি ইত্যাদি মনে পড়ে যাবার পর বেশ মেঘ-মেঘ বৃষ্টি-বৃষ্টি ভেজা-ভেজা দারুণ রোম্যান্টিক চিঠি লিখবে, তা না, ও লিখল—ভাই রাজা, এখানে কাল আসিয়াছি। আনারস ভীষণ সস্তা। খুব খাইতেছি। আলু, পটল এবং অন্যান্য শাক-সব্জিও দারুণ সস্তা। সবচেয়ে আনন্দের কথা, এখানে সিলেটের ইলিশ অফুরন্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি···।

এমন চিঠি, একজন একুশ-বাইশ বছরের শিলং-এ প্রথম পা দেওয়া ছেলে, সে যদি হবু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হয়, তবে আর কে লিখতে পারে?

চিঠি পাওয়া মাত্র বুঝতে পেলাম, অ্যাকাউন্ট্যান্সীই ওর লাইন এবং ও অক্লেশে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবে এবং জীবনে বিলক্ষণ উন্নতি করবে।

কিন্তু আমি?

যখন আমার দরজা বন্ধ করে ঘড়ি ধরে হোল্ডিং কোম্পানীর ব্যালান্স শীট মেলাবার কথা, ঠিক তক্ষুনি ষড়যন্ত্র করে দুপুরের রোদে বাড়ির লনে একজোড়া ঘুঘু এসে ঘুরঘুর করে, রঙ্গনের ডালে

বসে বুলবুলি সুমধুর শীষ তোলে, পাশের বাড়ির রেডিওতে হঠাৎ মোহরদির সুরেলা গান বেজে ওঠে, বুকের মধ্যে এক ভালোলাগা-ভরা ব্যথার শাওয়ার খুলে যায়। অথবা হঠাৎ সেই রুবীর দুল-পরা মেয়েটির মুখ মনে পড়ে যায়।

আমার সব গোলমাল হয়ে যায়।

ঠিক যখনি আমার অঙ্ক কষার কথা, তক্ষুনি ভীষণ কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে; ছবি আঁকতে, সাহিত্য পড়তে বা গান গাইতে ইচ্ছে করে, অথবা কিছুই-না-করে হাওয়ায়-দোলা নিমগাছের ফিনফিনে পাতাদের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমার সবকিছুই করতে ভালো লাগে, শুধু এই অ্যাকাউন্ট্যান্সীর অঙ্ক করা ছাড়া। অথচ আমি জ্ঞান-পাপী। এই অঙ্ক করাটা যে আমার আশু-কর্তব্য, এই বোধটা আমাকে সবসময় পীড়িত করে। ভিতরের খেয়ালী, ভাবুক, অন্যমনস্ক আমিটা বাইরের খোলা অঙ্কের বইয়ের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যের কবিটা বাইরে এসে দূর থেকে বুকের মধ্যে হবু-অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ভয়-ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে। বেলার মনে বেলা বয়ে যায়, অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে হলে একটা নির্দিষ্টকাল যে চোখ-কান-বোঁজা ঘানি-টানা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সে-সবের ধারেকাছে যেতে মন সরে না আমার।

একদিন বাবা ব্রেক-ইভন্ পয়েন্ট-এর গ্রাফ আঁকতে দিয়েছিলেন। দেখি, অনবধানে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভাব ও সুরের সুষম সমন্বয়ের গ্রাফ এঁকে বসে আছি।

এই কুকর্ম আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই নিজের কান মলেছি। যাই করি-না কেন, আমার সমস্ত মন অনেকগুলো অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে আমার কানের কাছে সবসময় বলত, আমার সামনে দুরন্ত দুর্দিন। আমার জন্যে আমার বাবা এবং আমি দু'জনেই সমান দুঃখিত ও আহত হব। দু'জনেরই সমান অসহায় অবস্থা হবে। এ কথা ভাবলেই, বাবার কথা ভাবলেই,

আমার মধ্যের অপরাধবোধটা কাঁটার মত বিঁধত। অথচ আমার কিছু করার ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও আমি ভিতরের অন্য আমিটাকে বদলাতে পারতাম না। মনে মনে বলতাম, ঐ-আমিটাকে গলা টিপে মেরেও আমার একজন সার্থক কেজোলোক হওয়া উচিত। কিন্তু পারতাম না। জানতাম যে, কখনও পারব না। একা আমার নিজের মধ্যে এমন জোর ছিল না যে, আমি একজন অবিন্যস্ত ভাবুক ও কবিকে টপকে গিয়ে বিন্যস্ত প্রাকটিক্যাল হিসাবরক্ষক হই।

তখন আমার এমন একটা বয়স যে, সে-বয়সের প্রত্যেকের বাবা তাঁর আদরের ছেলের মধ্যে একজন প্রতিপক্ষের অস্পষ্ট আভাস পান এবং প্রত্যেক মা তাঁর অনাগত পুত্রবধূর অনেকানেক কাল্পনিক দোষ সম্বন্ধে মনের মধ্যে কল্পনার কুণ্ডলী পাকান। ঠিক সেই সময়, সেই অমোঘ মুহূর্তে অ্যাকাউন্ট্যান্সীর অঙ্ক ও সেই কবীর দুল-পরা মেয়েটি আমার ব্যক্তিগত শান্ত ঘটনাবিহীন জীবনে এক সাংঘাতিক সাইক্লোন তুলল।

তার সাঁই সাঁই রব আমাকে ভয়ে সিঁটিয়ে দিল।

বাবার কাছ থেকে নিচে নেমে এসে দেখি, অর্ঘ্য এসে বসে আছে।

অর্ঘ্যকে দেখেই অ্যাকাউন্ট্যান্সীর বই তাকে তুলে রেখে বললাম, গান শোনাও। অর্ঘ্য জর্জদার কাছে গান শিখত।

দিনকয় আগে সুনন্দা পট্টনায়ক ও নাজাকৎ আলি সালামৎ আলি আমাদের বাড়িতে গান গেয়েছিলেন। অর্ঘ্যও শুনতে এসেছিল। সে সম্বন্ধে ও কথা তুলতেই বললাম, কথা পরে হবে, আগে গান শোনাও। অর্ঘ্য গাইল, 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না'। তারপর একে একে অনেক গান গাইল। অর্ঘ্যর গলায় গাওয়া আমার তখনকার প্রিয় গান ছিল, 'এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে, আজ বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।'

রাত প্রায় নটা নাগাদ অর্ঘ্য উঠলে, আমি খেতে এলাম উপরে।

বাবা খাওয়ার টেবিলে আমার উল্টোদিকে বসেছিলেন। রোজ বাবা একই চেয়ারে বসতেন।

বাবা বললেন, রাজা, তোমার গান-বাজনা, থিয়েটার একটু বেশি হচ্ছে না? এরকম করলে পাস করতে পারবে না কিন্তু। মনে থাকে যেন।

তারপরই বললেন, গানের স্কুলটা ছেড়ে দিতে পারো না আপাততঃ?

আমি মুখ নীচু করে রইলাম, জবাব দিলাম না।

বাবা বললেন, ভেবে দেখো। এখন বড় হয়েছ। নিজের ভালো নিজে না বুঝলে আর কে বুঝবে?

বাবার কথার মধ্যে সত্য ছিল। হয়ত সত্যিই বাড়াবাড়ি করছি আমি। কিন্তু বাবাকে কি করে বোঝাব যে দোষটা গানের স্কুলের বা বাইরের কোনো কিছুর নয়।

দোষটা আমার ভিতরের।

বাবা যা বলেন তা স্বভাবতই আমার ভালর জন্যেই।

কিন্তু ভাল হওয়া বোধহয় আমার কপালে নেই। গুরুজনেরা ভাল হওয়া বলতে যা বোঝেন তার ছিঁটেফোঁটাও নেই আমার মধ্যে।

তাছাড়া গানের স্কুল এই মুহূর্তে ছাড়া যায় না। এখন স্কুল ছাড়লে তো আর তাকে দেখতে পাব না। সে তো হারিয়ে যাবে বরাবরের মত। এতবড় কলকাতায় এত লোকের ভীড়ে কোথায় আমি খুঁজে পাব সেই একরত্তি বেণী-ঝোলানো মিষ্টি গলার মেয়েটিকে?

এত কথা বাবাকে বলা যায় না।

আমি চুপ করে খেতে লাগলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভাবলাম, পড়াশুনোয় বসি। কিন্তু আজ আর মন বসছে না। অর্ঘ্যের গান, বাবার কথা, এসব মিলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় রোজই এরকম কিছু না কিছু

হতো। এমন কি কোনো চাক্ষুষ কারণ না থাকলেও গোলমাল হতো।

ঘরের আলো নিবিয়ে জানালার কাছে এসে বসলাম চেয়ার টেনে। বাইরে জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। নিমগাছের কাকেরা ভুল করে ভোর হয়েছে ভেবে কা-কা-কা করে ডেকে উঠছে। জ্যোৎস্নার একটা লম্বা ফালি জানালা দিয়ে এসে ঘরের মধ্যে বিছানার উপরে পড়েছে।

পথ দিয়ে সেই বেহালাওয়ালা ছড়ের টানে টানে পরজ বসন্তের রেশ উড়িয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নাভরা আকাশের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

বেহালার সুরটা কাঁপতে কাঁপতে বুকের মধ্যে সযতনে তুলে রাখা কোনো জলতরঙ্গে তরঙ্গ কাঁপাতে কাঁপাতে একসময় মুছে গেল।

এলোমেলো হাওয়ায় ঘরে ও বাইরে গাছগাছালিতে পিছলে-পড়া চাঁদের আলোর নিচে ছায়াগুলো নাচানাচি করছিল। নানারকম ফুলের গন্ধ আসছিল লনের পাশের বাগান থেকে।

আমার হঠাৎ সামুকাকার কথা মনে পড়ে গেল। পুরোনো বাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন করে আসতেন সামুকাকা আমাকে গান শেখাতে তাঁর দিলরুবা কাঁধে ঝুলিয়ে। সেই বাড়ির পশ্চিমের ঘরের জানালার পাশে বসে দিলরুবা বাজিয়ে সামুকাকা এমন-এমন রাতে পরজ বসন্ত অথবা কানাড়ায় বসানো কোন্ গান গাইতেন। ওঁর কাছে আমার গান শেখার চেয়ে গান শোনার আগ্রহটা বেশি ছিল।

ওঁর কুচকুচে কালো চোখে, কাটাকাটা মুখে আর কাঁচা-পাকা চুলে কী যেন একটা উদাসী যোগীর ভাব ছিল।

গলাটা ছিল ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, কিন্তু বড় দরদ-ভরা।

এমনই এক রাতে সামুকাকা আমাকে 'আজি এ গন্ধ-বিধুর সমীরণে' গানটা তুলিয়েছিলেন। আমি তানপুরা ছেড়ে তুলছিলাম

আর উনি দিলরুবা বাজিয়ে গাইছিলেন। মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে।

সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে ভীষণ ভাল লাগে। কিন্তু পরক্ষণেই বড় কষ্ট হয়। আর কখনও তো সেসব দিন ফিরে আসবে না।

সুরেলা গলা শুনলে, আমার গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে যায়, নাভির কাছটা আনন্দের ব্যথায় পিন্‌পিন্ করে, স্বরের উদারা, মুদারা, তারা, সুরের আলাপ, তান, বিস্তার এসব মিলিয়ে আমায় কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন পায়ের তলায় মাটি পাই না। মনে হয়, এই সুরের স্রোতে, এই ভালো-লাগার অবশ করা আনন্দে যে জাহান্নমে গিয়ে পৌঁছবই পৌঁছব!

নাই-ই বা হলাম এ জীবনে সাকসেসফুল। না-ই বা চড়লাম মার্সিডিস গাড়ি।

এই আমি, আমার সুস্থ দেহ, জানালার পাশের এই লতানো বোগেনভেলিয়া, একটা আধ-পোড়া সিগারেট, মাথার মধ্যে ঝুমঝুম করে বাজা একজনের ভাবনা, আর এই একান্ত করে পাওয়া এলো-মেলো হাওয়া-বওয়া একটি চাঁদের রাত—এই নিয়েই একটা চমৎকার বেঁচে থাকা; একটা অভাবনীয় জীবন।

তোমরা যাকে বড় হওয়া বলো, তেমন হতে আমার সাধ নেই, আমার প্রয়োজনও নেই; বিশ্বাস করো। কেজো পৃথিবীর সমস্ত সাকসেসফুল লোকেরা, বাবা, মা, তোমরা সকলে বিশ্বাস করো।

আমার সত্যিই প্রয়োজন নেই।

॥ ৩ ॥

সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে।

গড়িয়াহাটের মোড়ে আমি সবে বাস থেকে নেমেছি অফিস-ফেরতা। হঠাৎ একটা দোতলা বাসের উপরতলায় জানালার-ধারে-বসা তার মুখের একঝলক দেখতে পেলাম।

হু-হু করে আলো-জ্বলা বাসটা চলে গেল। হু-হু করে আমার বুক জ্বলে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মন এক ভাষাহীন আনন্দ ও বেদনায় ভরে গেল।

অনেকক্ষণ আমি ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর বাড়ির দিকে হেঁটে আসতে লাগলাম।

বেশ শান্তিতে ছিলাম এ ক'দিন। এমন কি আজ সকালেও বেশ কয়েকটা ব্যালান্স-শীট মিলিয়েও ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম —আমার মধ্যের শীতের দিনের সাপের মত ঘুমিয়ে-থাকা কেজো লোকটার সমস্ত লক্ষণ ও গুণাগুণ ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হচ্ছে। কিন্তু অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় আবার সব গোলমাল হয়ে গেল।

তার ক'দিন পরে সকালবেলা হঠাৎ রেডিও খুলেই চমকে উঠলাম। কে যেন গাইছে :

'মরি গো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে ?'

এ গলা আমার ভীষণ চেনা।

প্রশ্বাস নেবার শব্দ, উচ্চারণ, সবকিছু আমার কানে গেঁথে ছিল। গান শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সে গাইছিল :

'দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,

তারে বলে আসি তোমার বাঁশী
আমার প্রাণে বেজেছে।'

আমার সমস্ত মন উহু-উহু করে উঠল।

আমার জন্যে কেউ যে কখনও এমন করে গাইতে পারে, তা কখনও আমার মনে হয়নি। আমার মন যেন কেবলি বলতে লাগল, আমার যেমন করে তাকে ভালো লেগেছে, তারও নিশ্চয়ই আমাকে তেমন করেই ভালো লেগেছে। এ ভাবনা, এ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু আমার মন বারে বারেই বলতে লাগল যে, আমিও তার মতন করেই তাকে বলে আসি, তোমার বাঁশী আমার প্রাণে বেজেছে।

সেই গান শুনতেই বুঝলাম যে, আমার গায়িকা আজকাল রেডিওতেও গান গাইছে।

কেন জানি না, ওর গান সেই প্রথম দিন শোনার পর থেকেই আমার মনে হতো, মন বলত, একদিন ও খুব বড় গায়িকা হবে। অল্পবয়সের পাখির চিকন গলার স্বর সরে গিয়ে যখন ভরা যুবতীর গলার ঝরণাতলার কলস-ভরার গভীরতা লাগবে গলায়, তখন সে সম্পূর্ণা হবে।

আমার মনে হতো, রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্য সব গানের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুরের সঙ্গে তাল মেলালেই এখানে গান জন্মায় না। এখানে ভাব, গায়কী, সুর, তাল, লয়, উচ্চারণ, নিঃশ্বাস ফেলা আর প্রশ্বাস নেওয়া, প্রতিটি সূক্ষ্ম ও আপাত সহজ ব্যাপারই অত্যন্ত জরুরী। এ সমস্ত কিছু মিলেমিশে ওরিশী ফিলিগ্রী গয়নার মত এই গানের আবেদন। শুধু গলা থাকলে, শুধু সুর থাকলে, শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পটভূমি থাকলেই এ গান কেউ যথার্থভাবে গাইতে পারে বলে আমার মনে হতো না।

গানের কথার মধ্যে দিয়ে যা বলা হয়েছে, মনের কথার সেই আভাষ, গায়কীর বিভাসে প্রতিভাত না হলে, সুরের সঙ্গে ভাবের, লয়ের সঙ্গে তালের এক আশ্চর্য আশ্লেষের মধ্যে পরিপ্লুতি না ঘটলে

এ গান আর গান হয় না। তাই অনেকেই যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, কিন্তু তা সঙ্গীতই হয়; রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না।

এ সব কথা মাঝে মাঝে আমার গানের স্কুলের বন্ধু রাণাকে বলতাম। নড়িদা, সৈয়দ আমানুল্লা, অমর, ওদের সঙ্গেও আলোচনা করতাম। ওদের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত স্বরূপ ও গায়কী নিয়ে আলোচনা হতো। আমরা সকলেই সোৎসাহে আলোচনা করতাম, অন্যেব মতামত শুনতাম, নিজের মতামত জানাতাম।

আলোচনার শেষে আমি বলতাম, দেখো, বুলবুলি কালে একদিন বেশ ভাল গাইবে।

রাণা তাচ্ছিল্যের গলায় বলতো, ফুঃ—কিস্‌স্যু হবে না। কাকার স্কুল থাকলে অনেকেই এমন সোলো গানেব চান্স পায়। এ জীবনে মই ধরে কাউকে তোলা যায় না, বুঝলে রাজা। তোলা হয়তো যায়, তা কিছুটা অবধি, তারপর সবাইকেই নিজের নিজের পায়ে ভর করেই দাঁড়াতে হয়; একমাত্র নিজের গুণে। সেই উচ্চতায় পৌঁছে কাকা জ্যাঠা মামা মাসী কেউই আব কাজে লাগে না।

আমি রাণার কথা শুনে হাসতাম। ঝগড়া করতাম না, কিন্তু বলতাম, দেখো হয় কি না।

আসলে ওর রাগের কারণটা আমি বুঝতাম।

ওর প্রতি আমাদের স্কুলের একটি মেয়ে খুব অনুরক্তা ছিল। ও-ও তাকে খুব ভালবাসত। সেই মেয়েটি গান গাইত ভালই। কিন্তু তাকে সোলোর চান্স দেওয়া হয়নি সেবারে। তাই রাণার মনে লাগার কথা।

এ কথা জেনেই ওর সঙ্গে ঝগড়া করতাম না। তাছাড়া, এটা ঝগড়ার বিষয়ও না। বিশ্বাসের বিষয় ছিল। আমিই ঠিক কি রাণাই ঠিক, তা প্রমাণিত হবে আজ থেকে দশ-পনেরো বছর পরে। এখন এই মুহূর্তে আমার কল্পনার মানসী এবং রাণার জলজ্যান্ত গার্লফ্রেণ্ড দু'জনেই গাইয়ে জীবনের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দু'জনকেই প্রমাণ করতে হবে নিজের নিজের গুণ—তাদের

নিজের নিজের জীবনে ও যৌবনে।

এদিকে থিয়েটারের রিহার্সাল পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেছে। আমরা এবার রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গীর একটি গল্প—"রবিবার" নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করব। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীমতী শান্তিশ্রী নাগ।

শান্তিদি প্রায়ই রিহার্সালে আসতেন। খুব সুন্দর করে সাজতে জানতেন শান্তিদি।

এখন অনেকেই সাজতে শিখেছেন। কিন্তু তখন রুচি ব্যাপারটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ছিল, রুচিটা আজকের মত এমন স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড্ হয়ে যায়নি। তখন যাঁরা সাজতে জানতেন, তাঁরা বেশি ছিলেন না সংখ্যায়।

উনি ঘরের কোণায় বসে মহড়া দেখতেন।

বৌদি 'বিভা'র চরিত্রে অভিনয় করছিলেন, রবিবার-এ বিভার চরিত্রে বৌদিকে অভিনয় করতে হতো না। ওঁর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের বিভা এমনিতেই আরোপিত হয়েছিল।

মহড়ায় আরো আসতেন সলিল সেনগুপ্ত, প্রায় রোজই।

উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল। চশমা চোখে অপলকে আমাদের দিকে চেয়ে থাকতেন। দেখতেন, কে কেমন অভিনয় করি। দেখতেন আর অনর্গল সিগারেট খেতেন।

মহড়া ব্যাপারটা যখন বেশ একঘেয়ে হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, রবিবার-এর নাট্যরূপে একটা কলেজের ফাংশানের ব্যাপার আছে। তাতে চন্দ্রিকা নাচবে এবং বুলবুলি গান গাইবে।

ওরাও মহড়ায় আসতে আরম্ভ করল মাঝে মাঝে।

গানটা ছিল বাহার রাগাশ্রিত। 'আজি কমল মুকুল দল খুলিল, দুলিল রে দুলিল, মানসসরস রস পুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।' যেদিন ওরা প্রথম এল মহড়াতে সেদিন থেকেই মহড়ার আকর্ষণ আমার কাছে অনেক বেড়ে গেল।

চন্দ্রিকা ভারী ভাল নাচত।

ওর চোখমুখের অভিব্যক্তির তুলনা ছিল না।

আরো একজনের নাচ খুব ভাল লাগত। তাঁর নাম ছিল মন্দিরা সেন রায়।

যাই হোক, বুলবুলির সঙ্গে ওখানে আমার প্রায়ই দেখা হতে লাগল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

চোখে চোখ পড়লেই আমার বুকের মধ্যেটা কেমন করত যেন। ও-ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিত, মুখ দেখলে মনে হতো, এইমাত্র ক্যাস্টর অয়েল খেয়েছে।

যখন দেখা হতো না, তখন বাড়িতে আয়নার সামনে বসে ওর সঙ্গে কি কি কথা কেমন করে বলব, সেসব রিহার্সাল দিয়ে রাখতাম। কিন্তু দেখা হলে বৃষ্টি-ভেজা কাকের মত মিইয়ে যেতাম। যতটুকু সময় ও সামনে থাকত ততটুকু সময় ও যে আছে, আমার সামনে আছে, কাছে আছে, এই জানাটুকুই আমাকে দারুণ এক ভালো-লাগায় আচ্ছন্ন করে রাখত। ওর দিকে তাকাবার প্রয়োজনই বোধ করতাম না। মনে মনে ভাবতাম, ও তো আমারই; তাড়া কিসের?

আসলে, ও যখন আমার পাশে থাকত তখন আমি রাজার মত ব্যবহার করতাম। যেন আমার কিছুরই অভাব নেই। প্রয়োজন নেই তার ভালোবাসার। অথচ ও যেই চলে যেত, অমনি কাঙালের মত হায় হায় করত আমার সমস্ত মন।

মন বলত, কেন আর একটু তাকালাম না ওর দিকে, কেন একটু সাহস করে কথা বললাম না।

সেদিন মহড়ার শেষে বেরোচ্ছি স্কুল থেকে, সলিলদা বললেন, কি হে? সিনেমা করবে?

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম।

থিয়েটার করছি তাতেই মধ্যের হবু অ্যাকাউন্ট্যান্টের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। তার উপর সিনেমা?

সলিলদা শুধালেন, তোমাদের বাড়ি কি খুব কনসার্ভেটিভ ?

একটু ভেবে বললাম, যাদের কনসার্ভ করার কিছু থাকে তারাই সাধারণত একটু কনসার্ভেটিভ হয়।

উনি বললেন, জিগ্‌গেস করে রেখো।

ভাবলাম, জিগ্‌গেস করে কে মার খাবে ?

তবুও পর দিন সত্যি সত্যিই সকালে সলিলদার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে যেতে হলো। যাঁর কাছে গেলাম, তাঁর নাম চিত্ত বসু। ফিল্মের পরিচালক।

লোকে যেমন করে চোর-ছ্যাঁচড়কে দেখে, তেমন করে সেই সুপুরুষ পরিচালক আমার মুখে চেয়ে রইলেন। ক্যামেরা ফেসের খোঁজে।

নাকটা ছোটবেলায় রীতিমত শার্প ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ঠাকুমা সেটাকে আরো উন্নত করার চেষ্টায় খাঁটি সর্ষের তেল নাকে রগড়ে রগড়ে ঘষে আমার বাঁশীর মত নাকটির সর্বনাশ ঘটিয়ে রেখেছিলেন।

চিত্তবাবু বললেন, করবে ?

বললাম, কি বই ?

উনি বললেন, পুত্রবধূ। উত্তমকুমার, মালা সিন্‌হা হিরো-হিরোইন।

আমি বললাম, আর আমি ? ভিলেইন ?

না। ভিলেইন না। খুব ভাল ছেলের রোল।

এবং বোকা ছেলের ? আমি বললাম।

বোকা নয়। মহৎ। উনি বললেন।

আমাকে বাড়িতে জিগ্‌গেস করতে বলা হলো। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে সাহস আমার ছিল না। একে পরীক্ষার আগে থিয়েটার করছি, তার উপর সিনেমা !

অবশ্য আমাকে চিত্তবাবুর পছন্দ হয়েছিল কিনা, এবং আমার চিত্তবাবুকে পছন্দ হয়েছিল কিনা তা আমরা কেউই কাউকে স্পষ্ট করে জানাইনি।

যে কারণেই হোক, আমার সিনেমা করা হলো না।

উত্তমকুমার জানলেনও না যে, সেদিন তাঁর কত বড় ফাঁড়া কেটে গেল।

দেখতে দেখতে থিয়েটারের দিন এসে গেল।

নিউ এম্পায়ারের জেন্টস্ গ্রীন-রুমে আয়নার সামনে বসেছিলাম। মেক-আপ ম্যান মেক-আপ দিচ্ছিল।

আমার আশেপাশে অন্য সব অভিনেতারাই বসে মেক-আপ নিচ্ছিলেন।

এই গ্রীন-রুম ব্যাপারটা আমার দারুণ লাগে।

এক মুহূর্ত আগে ছিলাম একজন, পর মুহূর্তে হয়ে গেলাম অন্যজন।

মেক-আপ নেবার পর আয়নায় নিজের ছবি দেখে নিজেকেই চমকে উঠতে হয়। বলতে ইচ্ছে করে আয়নার আমি কে—এই যে, ভাল আছেন? আপনাকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে!

মেয়েদের মেক-আপ রুম থেকে বৌদি বেরুলেন।

মেক-আপ নিয়ে বৌদির বয়স দশ বছর কমে গেছে। চশমা-খোলা, তীক্ষ্ণ নাক, বড় বড় বুদ্ধিভরা চোখ ও দারুণ ফিগারে বৌদিকে কী যে মিষ্টি লাগছে!

দেখি, বৌদির পাশেই সে। মানে, সেই গাইয়ে।

একটা লালের উপর কালো কাজের মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি পরেছে। সেও একটু সেজেগুজে নিয়েছে। গানই তো গাইবে, তার আবার অত সাজ কিসের?

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। মনে মনে বললাম, আমার বয়েই গেল!

এতদিন মহড়া দিয়েছিলাম, ঠিকই ছিল। কিন্তু আসল সময়ে স্টেজে ঢুকতেই মাথা ঘুরে গেল।

এতগুলো লোক ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকেই চেয়ে আছে, যেন আমি শর্মিলা ঠাকুর। তার উপর আবার মুখের উপর আলো

পড়ছে উইংস-এর পাশ থেকে।

প্রম্পটার জোরে জোরে প্রম্পট করতে লাগলেন।

প্রথম কয়েক মিনিট রীতিমত নার্ভাস ছিলাম। তারপর যেমন করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাইফেলের ব্যারেল আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠে, তেমন করে আমিও পার্ট বলতে বলতে গরম হয়ে উঠতে লাগলাম।

স্টেজে উঠলেই আমার মনে হতো, জগন্নাথ যদি কখনও মঞ্চের অভিনেতা হতেন তাহলে নির্ঘাত সমস্যাটা থাকতো না। কারণ তাঁর হাতের বালাই নেই। স্টেজে ওঠবার পর হাত দুটোই হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা। সে দুটোকে কোথায় রাখি, সে দুটোকে নিয়ে কি করি, এই ভাবতে ভাবতেই পার্ট ভুলে যেতে হয়।

রূপদার এক জ্যাঠতুতো বোনের সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। ও খুব ভাল নাচত। ও সব সময় হাসিখুশি থাকত। নাম ছিল দীপা। বয়সে ও বুলবুলির চেয়ে অনেক ছোট ছিল।

আমি স্টেজ থেকে উইংস-এ ঢুকেছি, এমন সময় দীপা দৌড়ে এসে বলল, রাজাদা, দারুণ হয়েছে, দারুণ। জানেন, বুলবুলিদি না খুব ভাল বলেছে।

আমি অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওকে বোঝার চেষ্টা করলাম। কারণ, ও হচ্ছে বুলবুলির চর। অনুচর ও চর দুই-ই। সব সময়ে পিছনে পিছনে থাকে তার দিদির।

ওর মনের ভাব বুঝে নিয়ে বললাম, তোর দিদিকে বলিস, গানও খুব ভাল হয়েছে।

দীপা হাসল; বলল, আচ্ছা।

ও চলে যেতেই আমার গা জ্বলে গেল। মনে মনেই বললাম, কেন? তোমার দিদি কি বোবা? নিজের মুখে কি কথাটা বলা যেত না?

থিয়েটার শেষ হবার পর একবার তার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সে হাসছিল, বন্ধুদের সঙ্গে অনর্গল গল্প করছিল, কিন্তু আমাকে

দেখতে পেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। চুপ করে গেল।

ওকে দেখলে আমি এত খুশী হই, আর ও আমাকে দেখলে এমন বিমর্ষ হয় কেন? আমাকে কি ও দেখতে পারে না? আমি কি ওর দু' চোখের বিষ?

জানি না, আবার কতদিন পর, কিভাবে ওর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু পরের কথা পরে। আজকে আমার বড় আনন্দ। সে আমার অভিনয়কে ভাল বলেছে।

ভাবছিলাম, যা আমার অভিনয় নয়, যা সরল সত্য, যা বড় যন্ত্রণাময় আর আনন্দময় সত্তা, তাকেও কি সে এমনি করে ভাল বলবে? একদিন? কোনোদিন?

॥ ৪

অফিসে বসে বাংলা খাতার পোস্টিং চেক করছিলাম।

ইংরিজী, মাড়োয়ারী ও অন্যান্য খাতার মত বাংলা খাতাও স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। 'হরজাই' খাতে চার টাকা পাঁচ আনা ডেবিট।

'নাজাই' খাতে সাতশ পাঁচ টাকা ডেবিট। 'গরমিল' খাতে তিন টাকা দু আনা ক্রেডিট।

'হরজাই'-এর ইংরিজী প্রতিশব্দ মিসলেনিয়াস। 'নাজাই' মানে ব্যাড ডেটস্। 'গরমিল' অর্থাৎ ডিফারেন্স ইন ট্রায়াল ব্যালান্স। এরই নাম অ্যাকাউন্ট্যান্সী।

অ্যাকাউন্ট্যান্সীর আরো রকম আছে।

যেমন, "শরীর মেরামতী" খাতে। অবশ্য এ খাতে, সব খাতায় থাকে না। ক্যাশিয়ারবাবুর আফিং-এর নেশা ছিল, তাই মুহুরীবাবু প্রতিদিন শরীর মেরামতী খাতে দু'আনা করে ডেবিট করতেন আফিং-এর খরচা বাবদ।

মাঝে এক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার কোম্পানীর খাতা অডিট করতে যাচ্ছিলাম রোজ। দেখতে দেখতে এসে পড়লাম—ফিল্মের ডিরেক্টরের নামে তিন পয়সা ডেবিটে।

তিন পয়সা ডেবিটের গভীর তাৎপর্য বুঝতে না পেরে এ্যাকাউন্ট্যান্টকে শুধোতেই তিনি বললেন, ফিল্ম ডিরেক্টর আমাদের অফিসে এসে ভুলে ছাতাটা ফেলে গেছিলেন। বেয়ারা দিয়ে ছাতাটা তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। তাই বেয়ারার সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রাম ভাড়া তিন পয়সা তাঁর নামে ডেবিট করা হয়েছে।

সেদিন থেকে ফিল্ম লাইনের উপর আমার অভক্তি।

অফিসে বসে পোস্টিং করি সবুজ পেনসিল দিয়ে।

রাস্তার ওপাশের গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে রেকর্ড বাজে।

মনটা পাগল পাগল করে। মনের মধ্যে কি যেন একটা অসুখ। খেতে ভাল লাগে না, বসতে ভাল লাগে না, কাজ করতে ভাল লাগে না। পড়াশুনা করতে তো নয়ই। কিছুই ভাল লাগে না। শুধুই মাঝে মাঝে বড় বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

অডিট নোটস্-এর পাতায় কোনো গানের স্বরলিপি তুলি, স্কেচ আঁকি।

বাবার অফিস না হলে অনেকদিন আগেই আমার চাকরি যেত।

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, বিয়ে বাড়িতে কোথাও কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে না। পৃথিবীর তাবৎ হেলেন, ক্লিওপেট্রারা একটি বিরক্ত মুখের অল্পবয়সী মেয়ের কাছে নস্যাৎ হয়ে যায়।

অফিসে যাওয়া-আসার পথে জানালায় বসে শুধু তার কথাই ভাবি। অন্য কোনো কথা মনে করতে পারি না।

সেদিন অফিস-ফেরতা বিজুদাব বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম।

রাস্তাটা পেরোব এমন-সময় একটা কালো অস্টিন গাড়ি প্রায় আমাকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। যিনি চালাচ্ছিলেন সেই হোঁৎকামত ভদ্রলোক জোরে ব্রেক কষে মুখ বার কবে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, কি ব্যাপার ছোকরা? লব করছ নাকি?

রাগে আমার সারা গা জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছু বলার আগেই গাড়িটা চলে গেল।

বিজুদার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বিজুদা নেই। বৌদি আছেন।

বৌদি বললেন, কি হে সেন্টিমেন্টের বড়ি? বসো, বসো, চা খাও।

চা আসার আগেই প্রীতিদা এলেন। প্রীতিদার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। যেবারে বিয়ে ঠিক হলো সেবারে বসন্তোৎসবে আমরা

সকলেই শান্তিনিকেতনে গেছিলাম। খুব মজা হয়েছিল সেবারে। সকলে মিলে বিজুদার বাড়ি উঠেছিলাম পূর্বপল্লীতে।

যখনই শান্তিনিকেতনে যেতাম তখন কোনো উৎসব থাকলে মোহরদি স্নেহপরবশে আমাদের ডেকে ডেকে বৈতালিকে নিতেন।

বৈতালিকে গান গাইতে আমার কোনোদিনও ভয় করত না, কারণ আমার সরেস গলা অতজনের গলার মধ্যে চাপা পড়ে যেতই। ঐসব সমাবেশে কিছু কিছু ভাল গলার গায়ক-গায়িকা থাকেই লিড করার জন্যে। তাদের গলাই আলাদা করে শোনা যায়। অন্য সকলের গলা কোপাইয়ের বানের জলের মত একসঙ্গে খড়-কুটো বালি-পাথরে মিশে যায়।

সেবারে আলো দত্ত নাচলেন, 'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা হৃদয় আকাশে'। ভীষণ ভীড় ছিল। আমরা ভীড়ের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে নাচ ও যিনি নাচলেন তাঁকে দেখলাম। প্রীতিদা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু হয়ে তন্ময় হয়ে নাচ দেখছিলেন। নাচ শেষ হবার পরেই শুনলাম, প্রীতিদার সঙ্গে আলোদির বিয়ে হচ্ছে। মোহরদি ম্যাচ-মেকার।

মোহরদির স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে আমারও কোনোদিন এরকম চাঁদের আলোয় শালফুলের গন্ধে ভরা কোনো সুমুহূর্তে সদ্গতি হতে পারে মনে করে মোহরদির সঙ্গ ছাড়তাম না।

বৌদি বললেন, মোহরদি আসছেন শান্তিনিকেতন থেকে প্রীতির বিয়েতে। মোহরদির গানের লক্ষ লক্ষ অ্যাডমায়ারারের মধ্যে আমি একজন মাত্র ছিলাম। কিন্তু আমার একমাত্র অ্যাডমায়ারার ছিলেন মোহরদি। মানে, আমার নন, আমার চিঠির। কাউকে চিঠি লিখে আমি আজ অবধি এত প্রশংসা কারো কাছ থেকে পাইনি। মোহরদিকে বলতাম, সার্টিফিকেটটা বাঁধিয়ে রাখব।

মোহরদি আসছেন শুনে বললাম, বাঃ, খুব মজা হবে। কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই মজা শেষ হয়ে গেল।

দেখলাম, সে এসে ঘরে ঢুকল।

একটা অফ-হোয়াইট রঙা শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা অফ-হোয়াইট জামা, কপালে বড় টিপ, মুখে আজ ইউজিয়াল আমার দর্শন মাত্র পৃথিবীর সব রাগ, সব বিরক্তি।

বৌদি বললেন, আয় বোস্।

আমি ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠলাম। ও যদি আমার সামনে সত্যিই বসে পড়ে তাহলে তো কথা বলতে হবে। কিন্তু কি কথা বলব?

কিন্তু সেও দেখলাম, ইকুয়ালী আপসেট। সে সটান ভিতরে চলে গেল পর্দা ঠেলে।

তুতলে বলল, আসছি।

বৌদি বললেন, বুলবুলি, এখানেই বোস না!

সে বলল, আমার মাথা ধরেছে।

ভাবলাম, মাথা ধরলে কেউ সেজেগুজে বেড়াতে বের হয়?

আমি লক্ষ্য করলাম যে ও রীতিমত তোতলা। তোতলা তো ভাল গান গায় কি করে?

সে এল না, কিন্তু বিলক্ষণ বুঝতে পারলাম, বসবার ঘরের পর্দার আড়ালেই সে আছে এবং আমি কি বলি না বলি শুনছে।

প্রীতিদার তাড়া ছিল। অনেক জায়গায় নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে। তাই প্রীতিদা উঠলেন।

আমি চা খাব বলেছি বলেই বসে থাকতে হলো।

ভেবেছিলাম, তার কাকীর বাড়ি এসেছি, চা-টা সে নিজে হাতে ভদ্রতা করে আনবে। কিন্তু চা নিয়ে এল ক্ষ্যান্তমণি—বাড়ির ঝি। কোনো রকমে চা-টা খেয়ে বললাম, চলি বৌদি। আরেকদিন আসব।

বৌদি বললেন, এসো।

সেদিন বৌদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমায় আগে পরীক্ষাটা পাশ করতেই হবে। পরীক্ষা

পাস না করলে নিজের পায়ে নিজে না-দাঁড়ালে এ ব্যাপারে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।

আমার নিজের বলতে তো কিছুই নেই। ওকে যে আমি চাই, চিরদিনের মত চাই, একথা ওকে বলবার আগে আমার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা সুস্থ মূল্যায়ন করা দরকার।

বাবার পটভূমি আমার সেই মূল্যায়নে যেন কোনোরকমভাবে প্রভাব বিস্তার না করে। আমার মনে হতো, যে-পুরুষমানুষ বাবা, মামা কি জ্যাঠাকে অতিক্রম না করতে পারে, তাঁদের স্নেহভাজন হয়েও তাঁদের ছাড়িয়ে না যেতে পারে, তারা পুরুষ নয়। নিকটাত্মীয় পুরুষদের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বোধহয় একটা চাপা প্রতিযোগিতার সম্পর্কও থাকে।

যদি কেউ আমার বাবাকে দেখে আমার দাম ঠিক করে, আমার মনে হবেই যে, আমার দাম কানাকড়িও নয়। সেটা অপমানজনক।

কিন্তু একথাও সত্যি যে, আজকে আমার দাম সাড়ে-ছ'আনাও নয়। এই রকম দামী হয়ে আমি কোন্ মুখে কোনো গুণী মেয়েকে জানাব যে, আমার তোমাকে ভাল লাগে। নিজে ভাল না হলে, কোনো ভাল মেয়ের দায়িত্ব সম্মানের সঙ্গে নিতে না পারলে, তার কাউকে ভালোবাসার অধিকার নেই বলেই আমার মনে হতো।

অমন ভালোবাসা মেয়েরা বাসতে পারে। খুব ভালো মেয়ে দয়া করে কোনো বাজে ছেলেকে ভালোবেসে ফেললে কিছু বলার নেই। কিন্তু যে ছেলে নিজের অধিকারে তার প্রেমিকাকে চাইতে না পারে, যার জীবনের পরম প্রাপ্তি অন্যের দয়া-নির্ভর, সে নিজেকেও অসম্মান করে, আর যাকে ঘরে আনে তাকে তো করেই।

সবচেয়ে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে। তার আগে তার কথা ভাবব না। তার গান শুনব না। তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবার চেষ্টা করব আমি। যেদিন যোগ্য হব সেইদিনই গিয়ে বলব যে, তোমাকে আমি আমার জীবনে চাই। তার আগে কোন্

মুখে গিয়ে সেকথা বলি ? কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, ওকে যদি আমি বলার আগেই অন্য কেউ ওকে অমন করে চেয়ে বসে অথবা যদি ও বলে বসে—আপনি চান তো বয়েই গেল, আপনাকে আমার একটুও ভাল লাগে না।

তাহলে ?

তখন আবার মাইয়ে-পড়া নিজের কাঁধে নিজেই থাপ্পড় লাগালাম, থাপ্পড় লাগিয়ে বললাম, প্রেমের ব্যাপারে কোনো মধ্যপন্থা নেই। হয় বরমাল্য নয় ঝাঁটা। কিন্তু ইনিসিয়েটিভ আমাকেই নিতে হবে। কপাল ভাল হলে পৃথ্বীরাজের মত ঘোড়া টগবগিয়ে তাকে সামনে বসিয়ে ফিরে আসব, আর কপাল খারাপ হলে সেন্টিমেন্টের বড়ির শিশি হয়ে গিয়ে মোটা মোটা ব্যর্থপ্রেমের উপন্যাস লিখব।

সেদিনই রাতে বাড়ি ফিরে একটা রুটিন করে ফেললাম। পরীক্ষার আর সামান্যই দেরী আছে। এবার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দরজা বন্ধ করে সত্যিই শুধু পড়াশুনো করব। সকালে চিরতার জল খাব, বিকেলে স্কিপিং করব এবং শোবার সময় কালীমাতার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মনে যাতে কোনোরকম অসভ্য ভাবনা-টাবনা না আসে তার প্রতিজ্ঞা করব।

ঠিক করলাম, মন থেকে সেই পাখিকে কাকতাড়ুয়া দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবো হুস্‌স্‌ হুস্‌স্‌ করে।

বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ত, কোনো নতুন গাড়িতে নববিবাহিত কোনো দম্পতি পাশ দিয়ে চলে গেলেন জুইক করে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে পাঁচ হাজার বাইসন একসঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলত। ভাবতাম, কবে আমিও আমার বুলবুলিকে পাশে নিয়ে এমনি পিঁক পিঁক করে হর্ন বাজিয়ে যাব ?

পরমুহূর্তেই মনে হতো, প্রত্যেক প্রাপ্তির পিছনেই অন্য একটা ব্যাপার আছে। মূল্য দেওয়ার ব্যাপার। সেই মূল্য দিতে পারলে, কষ্ট করলে, একমাত্র তবেই আমার সামনে এক দারুণ

সম্ভাবনাময় পৃথিবী।

পিঁক-পিঁক হর্ন-দেওয়া গাড়ি, পাশে বসে-থাকা গুনগুনিয়ে গান-গাওয়া বুলবুলি। কিন্তু পাস না করতে পারলে দেখতে হবে যে, আমার সামনে দিয়ে কোনো ব্যাঙের মত ডাক্তার অথবা শিয়ালে-খাওয়া কই মাছের মত কোনো এঞ্জিনীয়ার বুলবুলিকে পাশে বসিয়ে পিঁক পিঁক করতে করতে আমার বুকে ব্যথার সিরিঞ্জ বসিয়ে চলে গেল।

উপায় নেই :

হায় কবি, হায়! সেন্টিমেন্টের বড়ি, তোমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হয়ে উপায় নেই।

একদিন রাত্রে খেতে বসে বাবা ক্যাজুয়ালি জিগ্‌গেস করলেন, তোমার রেজাল্ট কবে বেরোবে?

বললাম, দশ তারিখ; জানুয়ারীর।

বাবা বললেন, তুমি পাস করলে তারপর ইটস্‌ আপ টু য়ু। আমি চাকরি করলে এতদিনে রিটায়ার করতাম। তাই আমি রিটায়ার করব। ভাল করলে ভাল করবে, খারাপ করলে খারাপ। বাট হোয়াটেভার ইউ ডু, ইউ মাস্ট বী অন ইওর ওন। তুমি নিজে জীবনে কি চাও, কতখানি চাও তা শুধু তোমার একারই উপর নির্ভর করে। জীবনে যতটুকু দেবে ততটুকুই ফেরত পাবে। বেশিও নয়, কমও নয়। দা চয়েস ইজ ইওরস্‌।

সেদিন খাওয়ার পর আমার নিজের ঘরে এসে আমি প্রথম ব্যাপারটার সত্যিকারের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম যে, এটা একটা নিছক পাস-ফেলের ব্যাপার নয়, এটা আমার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বর ব্যাপার।

সব রকম অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বর ব্যাপার।

পরক্ষণেই হঠাৎ আমার মনে হলো, যদি ফেল করি তা হলে কী হবে? ফেল করা কাকে বলে, সেটার স্বাদ কী রকম? কিছুই জানি না। কিন্তু পরীক্ষার আর সাতদিন বাকী। এমতাবস্থায়

আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলাম যে, আমি ফেল করতে যাচ্ছি। এবং অন্য কোনো পেপারে নয়। অ্যাকাউন্ট্যান্সীতেই। একমাত্র তাতেই। ভগবানও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। কারণ অঙ্ক আমার আসে না। জাস্ট আসে না। আই কুডন্ট কেয়ার লেস।

আমি তক্ষুনি আস্তে আস্তে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে চোরের মত বাবার ঘরে ঢুকলাম।

বাবা ইজিচেয়ারে আধোভাবে শুয়ে ছোট বাতি জ্বালিয়ে কী যেন পড়ছিলেন। বললেন, কী ব্যাপাব?

আমি বললাম, আমি পরীক্ষা দেবো না।

বাবা সোজা হয়ে বসলেন। বইটা নামিযে বাখলেন।

বললেন, কেন?

আমি মুখ নীচু করে বললাম, আমি প্রিপেয়ার্ড নই।

বাবার চোয়ালটা শক্ত হয়ে এল। বললেন, কেন নও? তুমি কি অফিস থেকে ছুটি পাওনি? তোমার কি বইপত্র সব নেই? তোমার কি পড়াশুনার কোনো অসুবিধা হয়েছে?

আমি বললাম, না। আমারই দোষ।

বাবা বললেন, দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে যে তোমার কোনো এক্সকিউজ নেই, যে পড়াশুনা কবাব সময় পড়াশুনা করে না, তার ফেল করার এম্‌বেরাসমেন্টটা ফেস কবা উচিত।

তাবপব একটু চুপ কবে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, জীবনে ফেল করার শিক্ষাটাও একটা বড শিক্ষা। এবাব তুমি জানবে ফেল করতে কেমন লাগে। তোমার মনে যে একটা মিথ্যা গর্ব গজিয়ে উঠেছিল নিজের সম্বন্ধে, সেটা ভেঙে যাওয়াব সময় এসেছে।

শোনো, তোমাকে বেশী কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকুই জেনে রাখো যে, পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। পাস-ফেলটা বড় কথা নয়, পরীক্ষাতে কমপিট করাটাই বড় কথা। যারা ফেল

করার ভয়ে জীবনের কোনো পরীক্ষাতেই যেতে চায় না, তাদের কিচ্ছু হয় না। তারা কিছুই করতে পারে না জীবনে। পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে।

আমি জানতাম বাবা বেশী কথার লোক নন।

পরের ক'দিন আমার খাওয়া-দাওয়া, স্নান, ঘুম সব মাথায় উঠল। দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা আমি শুধু অ্যাকাউন্ট্যান্সীর অঙ্ক কষতে লাগলাম। আর কোনো বিষয়ে আমি ভয় পাই না।

এই বিষয়টা যে আমার বুদ্ধির বাইরে তা নয়। কিন্তু শুধু বুদ্ধি বা কন্‌সেপশান দিয়ে এ বিষয়ে পাস করা যায় না। এতে পাস করতে হলে মেহনতী মজতুর হতে হয়। আক্ষরিক অর্থে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজমিস্ত্রীও যেমন এক হাতে দশ দিনে একটা প্রাসাদ গড়তে পারে না, দশ দিন তেমনি অহোরাত্র অঙ্ক প্রাকটিস করেই পরীক্ষার হলে তিন ঘণ্টায় কেউ সব ব্যালান্স-শীট মিলিয়ে আসতে পারে না। এর জন্যে মাসের পর মাস মনোসংযোগ ও প্রস্তুতি লাগে।

আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করতে লাগল।

যখন দারুণভাবে খাটার সময়, তখন গান গেয়ে, থিয়েটার করে, টেনিস খেলে বেড়িয়েছি। যতটুকু লেখাপড়ার সময় ততটুকু সময়েও হয় ছবি এঁকেছি, নয় অন্য বই পড়েছি। এখন তো কাঁদলেও আর সময় ফিরবে না। সত্যি সত্যিই ফেল করতে হবে এ কথা কখনও ভাবতে পারিনি।

এ ক'দিন যখনি বাবার অফিস-ফেরতা গাড়ির হর্ন শুনতে পেতাম, ড্রাইভার যখন জোরে ব্যাক করে গাড়ি গ্যারাজে তুলত, তখন বড়ই খারাপ লাগত। উনি সপ্তাহে ছ'দিন অত খাটেন আর ভাবেন, আমি কবে ওঁকে রিলিফ করব, আর আমি কিনা নেচে-গেয়ে দিন কাটাচ্ছি। আমি নিজে যে অন্যায় করেছি সে কারণে নিজের জন্যে যা কষ্ট, তার চেয়েও বেশী কষ্ট হতো এই ভেবে যে, আমার জন্যে অন্য কত লোক কত কষ্ট পাচ্ছেন ; কষ্ট পাবেন।

মাঝে মাঝে নিজের মধ্যের খেয়ালিপনা, এই কবিত্বকে হামান-দিস্তায় ফেলে ছেঁচতে ইচ্ছে করত। কিন্তু কী করব? আমার রক্তের মধ্যে যে তা বাসা বেঁধে ছিল।

কখনও বা মনে হতো, সবচেয়ে কেজো কোনো রাজস্থানী ব্যবসাদারের শরীর থেকে সিরাম নিয়ে নিজের শরীরে ইনজেক্ট করি, যাতে একটু প্রাকটিক্যাল হই।

আমার মরে যেতে ইচ্ছে করত।

কোথায় আর দশজনের মত হব, সুখ্যাত হব, তা নয়, যত অকাজের আর অদরকারী জিনিসে আমার ঝোঁক।

কী যে করি আমি? কী যে করি?

মাত্র দশদিন বাকী।

মাত্র দশদিন পরে আমাকে একজন অনিপুণ মাতাদোরের মত অ্যাকাউন্ট্যান্সীর ষাঁড়ের গুঁতোয় রক্তাক্ত হতে হবে। সকলে হাততালি দেবে, আমি সম্মানের লাল নিশান ফেলে পালাতে থাকব, মাথার মধ্যে দেড় হাজার দাঁড়কাক ডাকতে থাকবে—কিন্তু আমার সম্মানের বুঁদির কেল্লা বাঁচানো যাবে না।

তাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

॥ ৫ ॥

মনের মধ্যে স্মৃতির ভাণ্ডারে যা থাকে তা দুঃখ ও সুখের সমষ্টি। তাতে সুখ ও দুঃখ কাটাকাটি হয়ে যেদিকে নিক্তির ভার বেশী, সে-দিকটাই জ্বলজ্বল করে, মনে থাকে। অন্য দিকটার কথা তেমন মনে থাকে না।

পরীক্ষা শেষ হবার পর কিন্তু মনে হলো, পরীক্ষা ভালই হলো। শেষের দিকের সব পেপারই ভাল হওয়ায় প্রথম পেপার দুটোর দুঃখজনক স্মৃতি মন থেকে প্রায় মুছে গেছিল।

এখন যতদিন না রেজাল্ট বেরোয় ততদিন আমার মুক্তি। মনে হলো জেলখানা থেকে ছাড়া পেলাম।

গানের স্কুলে ইদানীং একটা নতুন বিপত্তি দেখা গেছে। সেটা ভয়েস ট্রেনিং-এর ক্লাস। হারমোনিয়ামের ডালায় ঘন ঘন বাঁ হাতের থাপ্পড়ে গান মরে ভূত হব-হব অবস্থা।

এমনি সময়, আমাদের এক সহশিক্ষার্থী এক দুর্ঘটনার শিকার হলো। চক্রবর্তীমশায় ক্লাসে এসেই যে স্বরগমটি প্র্যাকটিস করে আসতে বলেছিলেন তা তাঁকে গেয়ে শোনাতে বললেন।

ও চোখ বন্ধ করে যথাসম্ভব মনোসংযোগের সঙ্গে গাইল।

ওর ফরসা, রোগা গলার নীল শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছিল গাইবার সময়। গান গাওয়া শেষ হলে সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল, চক্রবর্তীমশায় সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তারপর অনেকক্ষণ পর গলা খাঁকরে ওকে বললেন, সাধু সাধু। এই বয়সে তুমি যা আয়ত্ত করেছ তা আয়ত্ত করতে অনেক ওস্তাদের সারাজীবন কেটে যায়। বুঝেছ?

ও ঝোপের মধ্যের ছাতারে পাখির মত নড়েচড়ে বসে উৎসাহের

গলায় শুধোল, কী ?

চক্রবর্তীমশায় বললেন, এই সেদিন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বরসপ্তকের সাতটি স্বরই বেসুরে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আমি ভেবে পাচ্ছি না, তুমি এই বয়সেই এই সুকঠিন ব্যাপারটা কিভাবে রপ্ত করলে ?

তারপর এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, সত্যি আশ্চর্য !

ও মুখ নীচু করে বসে রইল।

আমরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

তারপরই আমাদের সতীর্থ স্কুল ছেড়ে দিল।

আমি দেখলাম, ট্রাফিক সিগন্যাল হলুদ হয়েছে—এই সময় সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া ভাল।

এই রকম কষ্ট করে গানের গ্রামারই যদি শিখতে পারব, তা হলে তো ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ব্যালান্স-শীটের ফর্মই মুখস্থ করে ফেলতে পারতাম।

আসলে কোনো রকম ব্যাকরণই আমার রক্তে নেই।

বাংলা কি ইংরিজী লিখে ফেলতে পারি পাতা পাতা, কিন্তু ব্যাকরণে ক্লাস থ্রীর ছেলের কাছেও আমার হার অনিবার্য। বৈয়াকরণদের আমার বড় ভয়। শুধু ভয়ই নয়, তাদের উপর একটা জাতক্রোধ আছে আমার।

আমি জানি, এটা গুণের কথা নয়; দোষের কথা। কিন্তু এটা সত্যি কথা। অথচ এই আকাট অজ্ঞতারও একটা দারুণ সুখ আছে। এ সুখটা পজিটিভ সুখ নয়, নেগেটিভ সুখ। যাঁরা এ সুখে সুখী, একমাত্র তাঁরাই জানেন এ সুখের গভীরতা কতখানি।

খেয়ালি, কবি ও ভাবুক ছেলেটা, যে ছেলেটার চাঁদ উঠলে গান গাইতে ইচ্ছে করত, কি বৃষ্টি পড়লে যার সঙ্গে বৈয়াকরণ লোকটার ভীষণ ঝগড়া লেগে যেত, সেই ভাবালু স্বাভাবিক গায়কটাকে যে মুহূর্তে ওস্তাদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা দেখা গেল, সে মুহূর্তেই সে পালিয়ে যাবে ঠিক করল।

অথচ ব্যাকবণ না জানলে যে কোনো কিছুই তেমন করে শেখা যায না, এ কথাটা তার একবাবও মনে হলো না।

ইতিমধ্যে একদিন পবীক্ষাব ফল বেরুলো।

আমি ফেল কবলাম।

কথাটা যত সহজে বলা গেল, মন অত সহজে নিল না।

যা ন্যায্য ও অমোঘ বলে জ.নতাম, অন্তত জানা উচিত ছিল, সেটাকেও নির্লিপ্তমনে মেনে নিতে পারলাম না, কাবণ সেটা আমাব মনঃপূত নয়। ফেল কবব জানতাম, তবু ফেল কবার পব মনে হলো যেন আমাকে পাস কবানোই উচিত ছিল।

খববটা অফিসে বসে পেলাম।

সমাজদাব পি টি আই থেকে জেনে এল।

ও পাস কবেছে, হয়ত স্ট্যাণ্ডও করবে। ও আবাব নতুন করে বে-ইজ্জত করল আমাকে।

অফিসেব বাথরুমে গিয়ে চোখ জলে ভরে গেল।

ফেলুড়ে হয়ে গেলাম আমি? জীবনে যা কখনও ছিলাম না!

সেদিন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে এগোলাম।

মোড়ের মাথায় কলেজেব এক পুবনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। সে তার অন্য বন্ধুদেব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল—রাজা, আমার বন্ধু, খুব ভাল ছেলে। পড়াশুনায় খুব ভাল।

কে যেন আমার বুকে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিল।

হঠাৎ আমার মনে হলো, ও জানে না যে, আমি এইমাত্র ফাইন্যাল সি এ পরীক্ষার অ্যাকাউন্টস্ গ্রুপে ফেল করেছি। ও জানলে আমাকে কখনও ভালো ছেলে বলত না। আর কেউ কখনও বলবে না যে, আমি ভাল ছেলে, বা কখনও ভালো ছেলে ছিলাম। আমার ভালোত্বের পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে অ্যাকাউন্ট্যান্সীর খাতা, পিকলস স্লাইসার-পেগলার, ফুকলিঙ্ক ইনস্টিট্যুটের কাগজপত্র, ইয়রস্টন ব্রাউন অ্যাণ্ড

স্মিথ-এর ভল্যুমস্ সব টেনে টেনে নামিয়ে সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখলাম।

বাবা আগামী রবিবার অনেক লোককে খেতে বলেছিলেন বাবার বাগানে। আমার পাসের খাওয়া!

আমার উপরে বাবার এত বিশ্বাস ছিল যে, আমি প্রিপেয়ার্ড নই বলা সত্ত্বেও বাবা কখনও ভাবতে পারেননি যে, আমি সত্যি সত্যিই ফেল করতে পারি।

বাবা দিল্লী গেছিলেন কাজে। সন্ধ্যার প্লেনে ফিরলেন।

আমি গাড়ির শব্দ শুনলাম। সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শুনলাম।

আমার মনে হচ্ছিল, বাবা যদি একটা শঙ্করমাছের চাবুক নিয়ে এসে আমাকে খুব চাবকাতেন তো আজকে আমার খুব ভাল লাগত। আমার অন্যায়ের, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে ওঁর কাছ থেকে শাস্তি পেলে আমার নিজের হাতে হয়ত আমাকে এমন করে শাস্তি পেতে হতো না।

কেউ যদি কাউকে নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি যে বিশ্বাসঘাতককে এমন করে যন্ত্রণা দেয় তা আমার জানা ছিল না।

বাবা উপরে গিয়েই নিশ্চয়ই জানবেন খবরটা। শুনেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন। যদি ডাকেন, তা হলে আমি উপরে গিয়েই বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলব, বাবা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো না, আমাকে মারো; খুব মারো। চাবুক দিয়ে মারো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

বাবা তবুও ডাকলেন না।

আমার পড়ার টেবিলে হাতে মাথা রেখে বসেছিলাম আমি। মনে মনে আমার কাব্য রোগ, আমার খেয়ালিপনা, আমার সেই মিষ্টি গলার বুলবুলি, এই অভিশপ্ত আমিকে, আমার সবকিছুকেই থুথু দিচ্ছিলাম।

নিজেকে বলছিলাম, আমার চেয়েও কত সাধারণ ছেলে এ পরীক্ষা সহজে পাস করে যায়, আর আমি পারলাম না ?

ওদের কাছে হেরে যাওয়াটা বড় অপমানজনক।

অথচ আমি মনে মনে জানি যে, অর্থকরী পড়াশুনা করা ছাড়া, একটা ডিগ্রী পাওয়া ছাড়া এবং তারপর সেই ডিগ্রীর জোরে পাওয়া একটা কভেনাণ্টেড চাকরি, কোম্পানীর গাড়ি, সপ্তাহে একদিন চাইনীজ খাওয়া, ভাল ফিগারের একজন অন্তঃসারশূন্য ন্যাকা স্ত্রীর কামনা ছাড়া ওদের অনেকের জীবনেই আর কোনো কামনা নেই। ওদের কাছে জীবনের মানে ঐটুকুই।

অথচ ওদের কাছে এই পক্ষান্তরে সহজ পরীক্ষায় আমি এমন কঠিনভাবে হেরে গেলে কী করে প্রমাণ করব যে, এর চেয়ে কঠিনতর পরীক্ষায় ওদের আমি অক্লেশে হারাতে পারি। যে পরীক্ষায় কোনো টেক্সট-বুক নেই, যে পরীক্ষার সময়টা কোনো দিন বিশেষে বা ঘণ্টা বিশেষে নির্ধারিত নয়; যে পরীক্ষা জীবনময়, যে পরীক্ষা প্রতিমুহূর্তে, সেই পরম পরীক্ষার নাম জীবনের পরীক্ষা, অস্তিত্বের পরীক্ষা।

এ বাবদে আমার মনে কোনো সংশয় ছিল না যে, সেই যুদ্ধে আমি ওদের হ্যাণ্ডস-ডাউন হারাব, শুধু যদি এই প্রথম তোতা-পাখি পুঁথি-পড়া পরীক্ষাটায় পাস করতে পারি।

এ সব ভাবতে ভাবতে নোনা-চোখে কতক্ষণ অমনভাবে কেটে গেছিল জানি না, হঠাৎ পিঠে যেন কার হাতের স্পর্শ পেলাম।

মুখ ফিরিয়ে দেখি, বাবা।

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে চান-টান করে বাবা এসেছেন।

বাবা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, কখনও পিছনে তাকিও না। কাল থেকে ভাল করে শুরু করো। জেনো, এটাও একটা শিক্ষা; বড় শিক্ষা। ফেইলিওরস্ আর দা পিলারস্ অফ সাকসেস্। টেক ইট অ্যাজ আ ব্লেসিং।

বাবা আর কিছু না বলে, আবার উপরে চলে গেলেন।

আমাকে বকলেন না, আমার প্রতি বিরক্তি দেখালেন না, আমার উপর তাঁর বিশ্বাসে যে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরেছে তা কোনোক্রমেই বুঝতে দিলেন না।

আমি মেয়েদের মত ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগলাম। নিজের উপরে ঘৃণায় এবং বাবার ক্ষমাময় পুরুষালি ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার গলা বুজে এল।

বাবা একটু পরে ফিরে এসে বললেন, তুমি গানের স্কুলটা আপাততঃ ছেড়ে দাও। পরীক্ষাটা পাস করে নিয়ে তুমি সবকিছু কোরো, বারণ করব না।

তারপর একটু থেমে বললেন, আমার মনে হয়, ইউ হ্যাভ টু মেনী এগস্ ইন ইওর বাস্কেট। ভেবে দেখো।

আমি চুপ করে রইলাম।

মুসৌরী থেকে মুখার্জি জেঠু লিখলেন, 'ইউ মাস্ট পাস ইন ইওর মিয়াব এডুকেশানাল একজামিনেশানস্, দা ব্যাটল অফ লাইফ ইজ ইয়েট টু বিগীন।'

চিঠিটা পড়ে প্রথমে খুব রাগ হলো।

এ তো পরীক্ষা নয়, এ যে আখ-মাড়াইয়ের কল। ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং সব পরীক্ষাতেই ব্যাক পেপারস্ আছে। একমাত্র এ পরীক্ষাতেই সে-সবের বালাই নেই। এমন অদ্ভুত নিয়ম কেন যে করা, তা বুদ্ধির বাইরে। 'ব্যাটল অফ লাইফ' কথাটার মানে যে কী তা আমি তখন পরিষ্কার বুঝতাম না। তবে এটুকু বুঝতে পারতাম যে, গরীব বড়লোক নির্বিশেষে মানুষমাত্রকেই ব্যাটল অফ লাইফ লড়তে হয়। প্রত্যেক যথার্থ পুরুষকেই লড়তে হয়।

কেউ হয়ত শুধু নিজের প্রিয়জনদের কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে লড়াই করেন, কেউ বা করেন কোনো বিশ্বাসকে বা কোনো সুনামকে বাঁচানোর জন্যে। কেউ বা নেহাত তাঁর নিজেকে বা নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্যেই নয়, তার চেয়েও কোনো বড় কারণের জন্যে লড়াই করেন। এসব লড়াইয়ের সব লড়াই-ই

লড়াই। কোনো লড়াই-ই অন্য লড়াইয়ের চেয়ে কম নয়।

সে লড়াইকে আমার ভয় নেই, ভয় ছিল না কোনোদিন; একমাত্র ভয় এই চৌকাঠটাকে।

সে রাতে না-খেয়ে না-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বার বার ঘুমের মধ্যে জেগে উঠলাম। গলার কাছে কি যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠে আসতে লাগল। আমি নিজে কখনও এর আগে নিজের কাছে এমন করে শাস্তি পাইনি।

পরদিন একেবারে সকালেই ফুটপাথের নাপিত ডেকে মাথার চুলে এত ছোট করে কদমছাঁট লাগালাম, যাতে আমি বাইরে মোটে বেরোতে না পারি। মশারি থেকে ঢুকতে বেরুতে মাথায় মশারি আটকে যেতে লাগল।

বাইরে বেরোতে না পারলে বাধ্য হয়ে ঘরেই থাকতে হবে এবং ঘরে থাকলে অঙ্ক করতেই হবে। আমার ভাল লাগুক কি না লাগুক।

ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি একটা রুটিন করে ফেলে দিনের ও রাতের সমস্ত সময়টুকুকে একেবারে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেললাম। যাতে এক চুল পরিমাণ ফাঁক না থাকে, যাতে আমার চোখ বাইরের আকাশে না যায়, কখনও মন গান না গায়, কখনও কবিতা না লেখে। মনে-প্রাণে আমি যেন মুদী হয়ে যাই। অ্যাকাউন্ট্যান্সী যেন আমার রক্তস্রোতে বাহিত হয়।

ভগবানকে বলতাম, ভগবান! তপস্যা করে ন্যাড়া বিবেকানন্দ হয় আর আমি মুদী হতে পারব না?

মাসখানেক পড়াশুনা বেশ এগোল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে, আমি একেবারে প্রাকটিক্যাল হয়ে উঠেছি। এমন কি আমার এই আমি-কে আসল আমি-টার চিনতে পর্যন্ত কষ্ট হতে লাগল।

এদিকে কোলকাতায় বর্ষা নেমে গেছিল।

সারা দুপুর ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি পড়ত। নিমগাছে ভিজে কাক

গা ঝাড়া দিত। লনের কোণায় ঝোপ-ঝাড় থেকে কুটুরে ব্যাঙ ডাকত। কার্ণিসে নরম কবোষ্ণ পায়রাগুলো বকম বকম করত।

আমার গারো পাহাড়ের জিঞ্জিরাম নদীর বুকে নৌকোর ছইয়ের নীচের সেই বৃষ্টির দিনগুলোর কথা মনে পড়ত। বরিশালের স্টীমারঘাটের ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি। রংপুরের হরিসভার মাঠের পাশের কদমফুলের গাছ; বৃষ্টির মধ্যে হরিসভার পুকুরের মধ্যের পুরোনো কলার ভেলার উপরে হলুদ জলঢোড়া সাপের বৃষ্টিতে ভেজার কথা মনে পড়ত।

মনটা কিছুতেই সিঙ্গল এন্ট্রি বা ডাবল এন্ট্রিতে বাঁধা থাকতে চাইত না। এমন একটা দেশে ছুটে যেতে চাইত, যেখানে অ্যাকাউন্ট্যান্সীর জন্যে চিরদিনের নো-এন্ট্রি।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পথেঘাটে জল দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের বাড়ির ছোকরা চাকর সাদার্ণ অ্যাভিন্যু থেকে দেড়-সেরী কাতলা মাছ ধরে নিয়ে এল গামছা দিয়ে। বাচ্চারা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে আর চীৎকার চেঁচামেচি করে পাড়া সরগরম করে তুলল।

সেদিন পিছ-মোড়া করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখা কবিটাকে আর রাখা গেল না। সে সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল।

গায়ে খেলার গেঞ্জী চাপিয়ে আর সাদা শর্টস পরে জল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

একা একা জল ভেঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বুলবুলির কথা ভীষণ মনে পড়তে লাগল।

জানি না, সে এখন কি করছে। সে কি জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখছে? তারও কি সব সময় আমার কথা মনে হয়? আমার যেমন তার কথা মনে হয়! মনে যদি হয়েই থাকে তো সে সেই কথা জানায় না কেন? আমি যে সব সময় কত কষ্ট পাই, বুকের মধ্যেটা যে সব সময় মোচড়াতে থাকে, তবু কি সে বুঝতে পারে না? টেলিপ্যাথী বলে কি সত্যিই কিছু নেই?

হাঁটতে হাঁটতে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের চা খেলাম।

তারপর পাশের দোকান থেকে বুলবুলিদের বাড়িতে একটা ফোন করলাম।

টেলিফোন করেই ভাবনায় পড়লাম যে, কি বলব? ভাবলাম, যদি সে ধরে, তাহলে তার গলার স্বর তো শুনতে পাব একবার!

কিন্তু সে ধরলে কি কথা বলতে পারব? আর বলবই বা কি?

এমনই বরাত যে, ফোন ধরল বাড়ির চাকর।

বলল, কাকে চাই?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বললাম, দীপা।

দীপা এসে ফোন ধরল।

বলল, কি ব্যাপার? রাজাদা? আপনি হঠাৎ ফোন করলেন!

আমি বললাম, জল দেখতে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের ওখানে জল হয়েছে?

বলেই বুঝলাম, একেবারে বোকা বোকা কথা বললাম।

ও বলল, জল মানে? থৈ থৈ করছে। সিঁড়ি অবধি জল। আমাদের আমগাছের একটা কাক মরে গেল। একটু আগে।

আমি বললাম, ঈস্—। কি করে?

ও বলল, যা বৃষ্টি! ডাবল্ নিউমোনিয়া।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

ভাবলাম, মেয়েদের যখন মায়া পড়ে, তখন একটা কেলে কাকের উপরেও কত মায়া পড়ে! আর যখন পড়ে না? তখন আমার মত কোনো মানুষ মরে গেলেও তারা তাকায় না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, কি করছিলে?

ও উত্তেজিত গলায় বলল, আপনি জানেন, আজ বুলবুলিদির রেকর্ড বেরিয়েছে! আমরা গান শুনছিলাম।

আমি অবাক হলাম খুব।

বললাম, তাই নাকি? আমি জানতাম না তো! কি কি গান?

ও বলল—'আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া' আর 'আজ শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে'।

দীপা একটু পরে বলল, একদিন আমাদের বাড়ি আসুন না? সবাই মিলে গান-বাজনা করব? আমাদের বাড়িতে এখন খুব মজা।

আমি বললাম, কেন? মজা কেন?

দীপা বলল, রূপদার বিয়ে।

রূপদার যে কত অ্যাডমায়ারার তার ইয়ত্তা ছিল না। অমন চেহারা, তার উপর অমন গুণ, কোন্ মেয়ের না তাঁকে ভালো লাগে?

দীপা বলল, কার সঙ্গে জানেন?

আমি বললাম, বাঃ, আমি কি করে জানব?

দীপা বলল, ঝুমাদির সঙ্গে।

উনি না বোম্বেতে থাকতেন?

হ্যাঁ। থাকতেন। এখন কলকাতাতেই থাকবেন। আমাদের বাড়িতেই।

আমি বললাম, সেকি? উনি তো আমাদের বাড়ির সামনেই থাকেন।

দীপা বলল, জানি তো।

আমার মনে পড়ল, ওঁর ফিকে হলুদ-রঙা মার্সিডিস গাড়িতে প্রায়ই ওঁরা পিক্‌নিকে যেতেন। রূপদাকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। রঙচঙে ছুটির দিনের পোশাক পরে আসতেন এবং একসঙ্গে মিলে চলে যেতেন হৈ হৈ করতে করতে পিক্‌নিকে।

আমি বললাম, বাঃ, বেশ মজা তো তোমাদের।

ও বলল, তাই-ই তো। চলে আসুন একদিন।

টেলিফোন ছেড়েই আমি ঠিক করলাম এক্ষুনি গিয়ে রেকর্ডটা কিনতে হবে।

রূপদা কাকে বিয়ে করছে না করছে তা দিয়ে আমার কি

দরকার? আমার বুলবুলির রেকর্ড বেরিয়েছে, আনন্দে আমার ফেটে পড়তে ইচ্ছে করতে লাগল। এখন আর অন্য কিছু করা বা ভাবা নয়।

তাড়াতাড়ি জল ভেঙে মোড়ের গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমাদের সঙ্গে 'রবিবার'-এ অভিনয় করেছিল কণিকা মজুমদার, সুস্মির ভূমিকায়। ভারী মিষ্টি মেয়ে। ওর এক কাকা এ দোকানে কাজ করতেন।

আমাকে দেখে হাসলেন, বললেন, কি ব্যাপার? এই দুর্যোগে?

আমি বললাম, একটা রেকর্ড কিনতে এলাম।

উনি বললেন, কার রেকর্ড?

জোরে জোরে উচ্চারণ করলাম বুলবুলির পুরো নামটা।

নামটা উচ্চারণ করতে যে কী ভাল লাগল, কি বলব!

বললাম, আছে?

উনি একটা রেকর্ডের বাক্স নামালেন উঁচু তাক থেকে, দেখে বললেন, এতে তো নেই!

তারপর তাঁর পাশের ভদ্রলোককে বললেন, বুলবুলি কোথায় আছে?

ভদ্রলোক বললেন, পা দিয়ে নীচের ড্রয়ার খোলো, ঐ যে বাঁ-দিকের ড্রয়ার। ওর মধ্যে সব বুলবুলি আছে।

আমার ভীষণ রাগ হলো।

ভদ্রমহিলাদের পুরো নামটাও কি উচ্চারণ করা যায় না?

কণিকা, রাজেশ্বরী, সুচিত্রা, নীলিমা—কি অসভ্যর মত নাম ধরে ধরে ডাকছেন ওঁরা সকলকে, যেন গায়িকারা সকলেই ওঁদের ইয়ার্কির পাত্র। আর এমন করে বললেন না, পা দিয়ে ড্রয়ার খোলো, ওর মধ্যে বুলবুলি আছে।

রাগে গা জ্বলতে লাগল।

রেকর্ডের দাম দেওয়া হলে বললাম, কেমন বিক্রি হচ্ছে?

উনি বললেন, ভাল। নতুন রেকর্ড হিসেবে সেল ভালো।

তারপরই বললেন, আপনার কেউ হন নাকি?

লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে গেল।

বললাম, না, কেউ হন না। আমি একজন, মানে, এই একজন এ্যাডমায়ারার।

উনি বললেন, 'অ'। হ্যাঁ, আপনার মত অনেক এ্যাডমায়ারার আছে ওঁর।

রেকর্ড নিয়ে বেরিয়ে এসে মনে মনে বললাম, কিছু হয় না মানে?

আলবত হয়। আমার হয় না তো কি আপনার হয়? আজ কিছু না হলেও, একদিন হবে। আপনারা তো কার্ডবোর্ডের বাক্সে বুলবুলির রেকর্ড রেখেছেন, আমি আমার ঘরের মধ্যে পুরো বুলবুলিকে রেখে দেবো, তখন দেখবেন।

বাড়ি ফিরেই, আমার ঘরের গালচেতে আসন কেটে বসে রেকর্ড শুনতে লাগলাম।

গান শুনে আমার কান জুড়িয়ে গেল। সমস্ত বর্ষাকালটা যেন ময়ূরের কেকাধ্বনি, কেয়াফুলের গন্ধ, কদমফুলের নরম স্নিগ্ধতা, আকাশের মেঘ-গর্জন, জলপড়ার টুপটুপানি সমেত সেই গান দুটির মাধ্যমে আমার ঘরের মধ্যে চলে এল।

আমি রেকর্ডটাকে চুমু খেলাম। বললাম, সাবাস বুলবুলি!

এখন আমার শুধু যোগ্য হতে হবে নিজেকে।

আমাকে তোমার গানের যোগ্য করে তুলতে হবে।

একদিন পড়াশুনা করে এই অ্যাকাউন্ট্যান্সীর ম্যারাথন দৌড়ে অনেকখানি বুঝি এগিয়েছিলাম, কিন্তু রেকর্ড কোম্পানী একটি রেকর্ড বের করে আমাকে আবার স্টার্টিং পয়েন্টে পৌছে দিয়ে এলেন।

পরদিন রাতেই আবাব নতুন বিপদ দেখা গেল।

আমি ডিভানে শুয়ে কষ্টিং পড়ছিলাম, হঠাৎ পাশের বাড়ির রেডিওতে একজনের গলা শুনেই আমার গায়ে ইলেকট্রিক শক্ লাগল।

তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে আমি রেডিও খুললাম।

এ গলা অন্য কারো হতেই পারে না।

অ্যানাউন্সার একটু পরেই জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন ওর নামটা।

আমার ভীষণ ভাল লাগতে লাগল।

বুলিবুলি আবার গাইল—

"মন দুঃখের সাধন যবে
করিনু নিবেদন তব চরণতলে,
শুভ লগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হল না
তব নয়নজলে ॥
রসের ধারা নামিল না, বিরহ তাপের দিনে
ফুল গেল শুকায়ে
মালা পরানো হল না তব গলে ॥"

কেন জানি না, ওর গান শুনলেই আমার সমস্ত শরীর-মন হাওয়া-লাগা কৃষ্ণচূড়ার মত থরথর করে কাঁপতে থাকে, বুকের মধ্যেটায় কি রকম যেন করে। তখন পৃথিবীর সব খারাপ লোকদের ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছা হয়।

গান শুনলেই মনে হয়, এ যেন রবি ঠাকুরের কথা নয়, গায়িকার নিজেরই মনের কথা। কারো মনের কথা এমন স্পষ্ট করে, এমন বাঙ্ময়ভাবে আর কীসেই বা বলা যায়? রবি ঠাকুরের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ লাগে নিজেকে—তাঁর গান না থাকলে বুলবুলি কি এমন করে তার কথা আমাকে বলতে পারত? অবহেলায় অথচ পরম যত্নে?

ওর রেডিও প্রোগ্রাম টেপ করেছিলাম সেদিন। সেই টেপ

এবং ঐ রেকর্ডের গান ছুটো, দিন নেই রাত নেই, বাজাতে লাগলাম।

আমার এ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া মাথায় উঠল।

ছুটির দিন একদিন হুপুরবেলা মেঝের গালচেতে বসে সামনে ইজেল নিয়ে ছবি আঁকছিলাম।

ভেবেছিলাম, ওর এই গানের (মানে রেকর্ডের) একটা বিফিটিং উত্তর দেওয়া উচিত—ওকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। ঠিক করেছিলাম, একটা ছবি এঁকে ফেলব বুলবুলির, অয়েল কালারে।

ছবি আঁকতে আঁকতে অনবধানে গুনগুনিয়ে গাইছিলাম—

'একলা বসে হেরো তোমার ছবি, এঁকেছি আজ বাসন্তী রঙ দিয়া, খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মোমাছি· ঐ গুঞ্জরে বন্দিয়া— ।'

ছবিতে নাক মুখ চোখ চিবুক অবিকল হলো, কিন্তু ওর মুখের সেই ভাবনাটুকু আঁকতে পারলাম না। কবে যেন তা চুরি হয়ে গেছিল।

কত দিন ওকে দেখিনি!

বিকেল গড়িয়ে গেছিল, ছবি তখনও শেষ হলো না।

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল।

চমকে উঠে বললাম, কে ?

ওপাশ থেকে মা'র গলা শুনলাম, আসব ?

আমি বললাম, এসো। খোলা আছে।

মা ঘরে ঢুকতেই বললাম, কি মা ? আমার ঘরে ঢুকতে কি তোমার পারমিশানের দরকার হয় ?

মা'র মুখ গম্ভীর দেখলাম।

মা বললেন, আজ হয় না, একদিন হয়তো হবে।

কি হয়েছে মা ?

বুলবুলির রেকর্ডটা পড়েছিল রেডিওগ্রামটার উপরে।

মা সেদিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

বললেন, ওটা কার রেকর্ড রে ?

আমি বুলবুলির নাম বললাম। আমার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

মা বললেন, মেয়েটি কে ? তুই চিনিস ?

আমি বললাম, চিনি বলা যায় না; মানে আলাপ নেই। তবে চিনি না বললেও মিথ্যে কথা বলা হয়। ভারী ভাল গান গায়, জানো মা ?

মা বললেন, হ্যাঁ ! গান তো এ ক'দিন ধরেই শুনছি, সারাক্ষণই শুনছি। তবে সব সময় গানই শুনবি তো পড়াশুনা করবি কখন ? তোর কি পরীক্ষা পাশ করার ইচ্ছা নেই ?

আছে। তবে পরীক্ষার সঙ্গে আমার যোগাযোগটা ঠিক হচ্ছে না মা।

মা বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোর জন্যে খারাপ লাগে। আমরা ক্লাবে যাই, পার্টিতে যাই, বেড়াতে যাই, আর তুই দিনরাত ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়াশুনা করিস।

আমি বললাম, পড়াশুনার চেষ্টা করি বলো। তুমি তো জানো যে এ আমার ভাল লাগে না।

মা বললেন, যাই হোক, আমার খুবই খারাপ লাগে।

তারপর মা আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, পাশটা কর, তারপর তুই গান গাস, ছবি আঁকিস, কিচ্ছু কেউ বলবে না। কিন্তু পরীক্ষাটা পাশ কর। বুঝতে পারি যে তোর খারাপ লাগে। কিন্তু দেখিস, পাশ করলেই তোর খারাপ লাগা চলে যাবে।

পরক্ষণেই মা বললেন, এটা কার ছবি আঁকছিস রে ?

আমি এক গাল হাসলাম। বললাম, বুলবুলির।

মা বললেন, তোর লজ্জা করে না ?

মা'র সুন্দর মুখটা খুব কঠিন দেখাল।

বললেন, যা শুনছি তাহলে সত্যি। এই মেয়েটাই তোর মাথা খাবে। এ সব বন্ধ কর, বন্ধ কর রাজা। তোর ভালোর জন্যেই বলছি। তোর বাবা এখনও এসব জানেন না। জানলে হয়তো তাঁর নির্ঘাত স্ট্রোক হবে। ছিঃ ছিঃ, তুই আমাদের এমন দুঃখ দিবি কখনও ভাবিনি।

আমি মেঝে থেকে উঠে ডিভানে বসে বললাম, আমি তো কোনো অন্যায় করিনি মা। তুমি কি শুনেছ জানি না, তবে তুমি যখন এ কথা তুললে, তখন বলি যে ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

ওকে মানে? ওর গান? মা বললেন।

হ্যাঁ, গান। গানও ভাল লাগে, ওকেও ভাল লাগে।

গান ভাল লাগে তো রেকর্ড শুনলেই হয়, রেডিও শুনলেই হয়। গান ভাল লাগে বলে গায়িকা-শুদ্ধু বাড়ি এনে তুলতে হবে এমন কথা তো শুনিনি কখনও। তার উপর গাইয়ে-বাজিয়ে বিয়ে করে কি কেউ সুখী হয়? তুই যখন সারাদিন পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরবি, দেখবি সে হয়তো গান গাইতে গেছে, কি রিহার্সালে গেছে। সংসারে সুখী হতে হলে সাধারণ সংসারী মেয়ে বিয়ে করতে হয়। এমন মেয়ে বিয়ে করে কেউ সুখী হয় না কখনও।

আমি উঠে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম; বললাম, মা, আমি কখনও এমন কিছু করতে পারি না, যাতে তুমি বা বাবা দুঃখ পাও। তবে তোমরাও তো আমাকে দুঃখ দিতে চাও না? তাই আমার একমাত্র অনুরোধ যে, আমার স্ত্রী কে হবে সে সম্বন্ধে মন স্থির করার আগে আমাকে কথা দিতে হবে যে, ওকে তোমরা দেখবে, ওকে বিচার করবে। যাচাই না করেই বাতিল করা কি ঠিক মা?

মা'র মুখটা সৌন্দর্যরহিত হয়ে উঠল।

মা বললেন, খুব বড় বড় কথা শিখেছিস তো! এত সাহস

তোর কি করে হলো ?

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না।

মা বললেন, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। তবে এটুকু তোমাকে বলে গেলাম যে, তুমি যা ভাবছ, তা হবে না। কখনও হবে না। তুমি যে এমন খারাপ হয়ে গেছ, খারাপ হয়ে যাবে, এমন বকে যাবে, তা কখনও ভাবিনি। তোমার বাবার মুখের দিকে চাইলে আমার কষ্ট হয়। এর জন্যেই কি তোমাদের বড় করা, মানুষ করা ?

এ কথা ক'টি বলেই মা দুম্ করে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

আমি অনেকক্ষণ একা ঘরে বসে থাকলাম চুপ করে।

বাবার জন্যে, মা'র জন্যে আমার মনটা ভারী খারাপ লাগতে লাগল। অথচ কি আমি করব, কি আমার করা উচিত, আমি বুঝতে পারলাম না।

যার জন্যে আমার এত কষ্ট, সে তো কখনও জানলো না যে, তাকে ভালোবেসে আমার সবকিছু নষ্ট হতে বসেছে। তাকে যদি কখনও জীবনে পাইও, আমি জানি না সে আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করবে, সে আমার এই ভালোবাসার, এই যন্ত্রণার মূল্য দেবে কিনা। আমি কিছুই জানি না।

বুলবুলির রেকর্ডটা তুলে রাখতে রাখতে বললাম, বুলবুলি, তুমি ভীষণ খারাপ। তোমার জন্যে আমার কত যে কষ্ট তা তুমি কখনও কি জানবে, কোনোদিনও কি জানতে পারবে ?

॥ ৬ ॥

ভোরবেলা উঠে চান-টান করে গায়ে হলুদ খদ্দরের পাঞ্জাবি চাপিয়ে ধাক্কা পাড়ের ধুতি পরে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম।

আজ আমাদের স্কুলের স্টীমার পার্টি।

অনেকেই এসে গেছিল। কিন্তু এসে পর্যন্ত আমার চোখ যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তাকে দেখা গেল না।

আমি ভাবছিলাম, তাহলে এসে কি লাভ হলো? এত বন্ধু-বান্ধবী, এত গান, এত হাসি, এত হুল্লোর, এত খাওয়া-দাওয়া, সবই আমার কাছে আনন্দহীন বলে মনে হতে লাগল। সে যদি না-ই আসে, তাহলে আমি এলাম কেন? তার চেয়ে বাড়ি বসে অ্যাকাউন্ট্যান্সীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করা ভাল ছিল।

শ্যামলদা এসেছিলেন। খুব ভাল ভূশণ্ডীর মাঠের গান গাইতেন শ্যামলদা।

শ্যামলদা ডেকের উপর সতরঞ্চি বিছিয়ে হারমোনিয়ম সামনে নিয়ে বসেছিলেন। ছেলেমেয়েরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল।

বড়দা, মানে বিজুদা, সুনীলদা, সুবিনয়দা, এঁরা সকলে একটু আলাদা বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন, গল্প করছিলেন।

বৌদি বড়দের এবং ছোটদের সঙ্গে সমানে আড্ডা মারছিলেন।

মেয়েদের মধ্যে কি কি গুণ পুরুষরা আশা করে তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না, কিন্তু বৌদির মত সম্পূর্ণা নারী আমি বেশী দেখিনি।

মোহরদি খুব সেজে এসেছিলেন।

সাজলে মোহরদিকে দারুণ লাগে। না-সাজলেও লাগে।

শান্তিনিকেতন বন্ধ। বীরেনদাও এসেছিলেন সেবারে।

আমি চিরদিন মোহরদির গানের এবং খেয়ালী অন্তরের অন্ধ ভক্ত।

মোহরদিকে যখন চিঠি লিখতাম, তখনই মোহরদি সেই চিঠির প্রশংসা করে আমাকে রীতিমত ফুলিয়ে দিতেন। জানি না, সেটা ঠাট্টা ছিল কি না।

আমি বললাম, আজ অনেক গান শোনাতে হবে কিন্তু।

মোহরদি পান খাচ্ছিলেন। ঢোক গিলে বললেন, শোনাব। ঢোক গেলার সময় ওঁর ফরসা গলার নীল শিরা বেয়ে লাল পানের পিক নামতে দেখলাম।

আমার কেবলই মনে হতো যে, মেয়েরা (সুন্দরী, অথবা অসুন্দরী) যেমন সাজতে ভালবাসেন, তেমন তাঁদের সাজের অ্যাপ্রিসিয়েশন পেতেও খুব ভালবাসেন। যদি এ্যাপ্রিসিয়েটই না করতে পারলাম, তবে ওঁরা কষ্ট করে সাজবেনই বা কেন? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে দেখবার জন্যে তো কেউ আর সাজেন না? অন্য লোকের চোখের আয়নায় তাঁদের প্রতিফলিত করবার জন্যেই সাজেন। তাই সেই আয়নাগুলোই যদি ফাটা হয়, তাতে যদি পারা খসে গিয়ে থাকে, তাহলে মেয়েদের সুন্দর সাজের মত ব্যর্থতা আর কিছুই নেই। সেই ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমরাই; আমাদের অপরাগ আয়নাগুলো।

মঞ্জরীদি, সুশীলদা, অমলদা, বাণী, সুহৃতা সকলেই এসেছিলেন। আরো কতজন এসেছিলেন।

সুহৃতা সেদিন অনেকগুলো অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়েছিলেন আমাদের। অমলদা শুনিয়েছিলেন শচীন কর্তার নতুন বেরোনো রেকর্ডের আড়ে-আড়ে গাওয়া গান।

স্টীমার ছেড়ে দিয়েছিল অনেকক্ষণ। সকালের চা ও জলখাবার খাওয়া হয়ে গেল। অথচ এ পর্যন্ত তাকে একবারও দেখা গেল না।

আমার চোখ সর্বক্ষণ চাতক পাখির মত চমকে বেড়াচ্ছিল,

কিন্তু তৃষ্ণার জলের দেখা ছিল না।

নড়িদা আমার উপর খুব চটে ছিল।

ভয়েস ট্রেনিং ক্লাসের মাস্টারমশাই আমাকে জিগ্গেস করেছিলেন, কারফা ঝম্পক রূপকড়া এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন তালের মাত্রা কত কত।

আমি যথারীতি ভুলভাল বলেছিলাম।

মাস্টারমশাই শুধিয়েছিলেন, কে শিখিয়েছে?

আমি অম্লান বদনে বলেছিলাম, নড়িদা।

নড়িদার দোষের মধ্যে নড়িদা নিজের সময় নষ্ট করে আমারই অনুরোধে বাড়িতে আমাকে তাল সম্পদে তালেবর করতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আমি অকৃজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেছিলাম, নড়িদা শিখিয়েছে।

নড়িদা কেবলই বলছিল যে, আমি সব ঠিক জেনেও নাকি ইচ্ছা করে ভুলভাল বলেছিলাম, নেহাত নড়িদাকে অপদস্থ করার জন্যেই। কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই ভুলভাল বলেছিলাম।

নড়িদা এত রেগে ছিল যে, মোটে কথা বলছিল না আমার সঙ্গে।

এক ঝাঁক সী-গাল উড়ছিল গঙ্গার উপরে। স্টীমারের প্রপেলারের ঢেউ দূরে দূরে নদীর পাড়ে পাড়ে আছড়ে পড়ছিল। জলের উপর দোল খাচ্ছিল ছোট ছোট মেছো নৌকোগুলো। ছইয়ের নীচে হুঁকো-হাতে বসে-থাকা মাছের মহাজন স্থির চোখে জলের দিকে তাকিয়েছিল। বোধ হয় ঢেউ গুনতে গুনতে ভাবছিল, কি করে আরো টাকার মালিক হওয়া যায়।

হালে-বসা পেট-পিঠ এক হওয়া মাঝি দূরের দিগন্তে চেয়েছিল।

মাঝির সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছিল। সেই মাঝিকে ঠিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-র হোসেন মিঞার মত দেখতে।

সী-গালগুলো তাদের নরম সাদা শরীর আর কমলা-রঙা ঠোঁটে

ঘুরে ঘুরে, স্টীমারটার সঙ্গে সঙ্গে উড়ছিল।

ওদের ওড়ার ছন্দ আমার চোখে লেগেছিল। রেলিং-এ ভর দিয়ে বসে আমি ভাবছিলাম যে, সব তালকেই যদি মাত্রার বাঁধনে বেঁধে লিপিবদ্ধ করা যেত, তাহলে সী-গালের ওড়াতে কোন্ তালের তালি বাজত? অথচ যদি কেউ বলে যে, যেহেতু এ তাল স্বীকৃত নয় সঙ্গীত শাস্ত্রে, সুতরাং ওদের এই ওড়ার মধ্যে, হাওয়ার গালচেয় নাচের মধ্যে, রূপোর জলে ছোঁ মারার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই, তাল নেই, ওদের বিরহী নগ্ন নির্জন স্বরের মধ্যে সুর নেই, তাহলে আমি মানতে রাজী নই।

সী-গালদের ওড়ার ও ওদের স্বরের উত্থান-পতনের স্বরলিপি বানাতে বললে কি ওদের ডানা কেটে, মাংস ছাড়িয়ে, ঠোঁট চিরে ওদের মধ্যের তাল ও সুরের শবব্যবচ্ছেদ করতে হবে? ওদের এই জীবন্ত নরম ডাকের কোনো স্বরলিপি হয় না কেন? আর নাই-ই যদি বা হয় তাহলে স্বরলিপির প্রয়োজন কি?

যা লিপিবদ্ধ করা না যায়, তা কি স্বর নয়। সুর নয়।

কেন জানি না, এসব কথা ভাবলেই আমার কেবলই মনে হতো যে, গানের গোড়ার কথা হচ্ছে শ্রুতি এবং গায়কী। যাদের ভগবান এ দু'টি আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাঁরা লক্ষ্ণৌর গরমে ভাতখণ্ডে স্কুলে গিয়ে দিনের পর দিন ভাত খেলেও কখনও গান শিখতে পারবেন না।

যার নিজের মধ্যে গান নেই, তাকে স্কুল কি করে গান গিলিয়ে দেবে, সে যত বড় স্কুলই হোক না কেন?

গান শিখতে হলে গানের বিজ্ঞান অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে, (যা পারব না বলে আমার কোনোদিনও গান হবে না) তবুও আমার কেবলই মনে হতো যে, গান কখনও শুধু বিজ্ঞাননির্ভর নয়।

ব্যাকরণ হচ্ছে সী-গালদের রক্ত, মাংস, হাড়, আর গান হচ্ছে ওদের উড়ে চলা, ওদের হাওয়ায় হাওয়ায় নাচ, জলের মধ্যে হীরে-ছিটিয়ে ওদের ছোঁ-মারা। যেটুকু ব্যাকরণ পড়ে শেখা যায় না,

সেটুকু নিজের মধ্যের জেনারেটরে উৎপাদিত করে নিতে হয়।

নিজের ভাবনায় নিজে বুঁদ হয়ে বসেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি, নীচের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ডেকে সে উঠে আসছে।

হলুদ আর লাল ডুরে একটা ধনেখালি শাড়ি, একটা লাল ব্লাউজ, দু'দিকে দুটি লম্বা বিনুনী।

ঐটুকু মেয়ে, কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সত্যিই যেন কত বড় হয়ে গেছে। কিংবা কি জানি, আমার চোখই হয়তো ওকে বড় করে দেখে আনন্দ পাচ্ছে।

হুহু-হাওয়ায় তার শাড়ির আঁচল উড়ছিল, বেণী দুলছিল, আর আমার মনের মধ্যে সুশীলদার গলায় শোনা সুরে ভরপুর সেই গানটি গুঞ্জরণ করে ফিরছিল—'কি সুর বাজে আমার প্রাণে, আমিই জানি আমার মনই জানে'।

স্টীমারের ডেকময় হাওয়াটা আমার বুকের মধ্যের ভাবনার মত দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল।

ওদিকে ততক্ষণে শ্যামলদার ভূশণ্ডীর মাঠে রীতিমত জমে উঠেছে।

ও-ও গিয়ে ওখানে বসল।

আমি একা গেলে দেখতে খারাপ লাগত; অন্য কারো কাছে নয়, হয়তো আমার নিজের কাছেই, তাই আমি নড়িদাদের সাধাসাধি করে নিয়ে গেলাম। বললাম, চলো না, গান শুনি গিয়ে, কী এক কোণে বসে আছ?

নড়িদা বিড় বিড় করে বলল, তোমাকে বোঝা ভার। তুমিই তো এতক্ষণ বললে যে ভীড় ভাল লাগে না, এসো নিরিবিলিতে বসি!

নড়িদাকে কি করে বলব যে, এই মুহূর্তে আমার ভীড়ই খুব ভাল লাগছে।

বাণী গাইল, মঞ্জরীদি ও সুশীলদা গাইলেন, তারপর আমরা বসন্তের গান গাইলাম দল বেঁধে।

দেখতে দেখতে বেলা হলো।

সময় যেন সী-গালদের মত উড়ছিল। এত গান, এত ভালো-লাগা, বুলবুলিকে চোখের সামনে এতক্ষণ দেখতে পাওয়ার সুখ, সব মিলিয়ে সময় যে কি করে কেটে গেল টেরও পেলাম না!

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আনন্দোচ্ছল বউদিদের কাছ থেকে পান চেয়ে নিয়ে খেলাম।

একসময় স্টীমারটা কলকাতার দিকে মুখ ফেরাল।

বেলা পড়ে এসেছিল।

শেষ বিকেলের ম্লান বিষণ্ণ আলো ডেকময় লুটিয়ে পড়েছিল। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে অনেক দূরে রেলিঙের ধারে চুপ করে বসেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে চার অধ্যায়ের লাইন দু'টি হঠাৎ করে মনে পড়ল আমার—'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।'

ও-পাশের চটকলের উঁচু উঁচু চোঙায় শেষ বিকেলের রোদ ঠিকরোতে লাগল। ইঁটের ভাঁটার লালচে রঙ আরো লাল হয়ে এল।

বিকেলের চায়ের পর্বও শেষ হলো।

আমার ভীষণ মন খারাপ লাগতে লাগল।

আবার কতদিন বুলবুলিকে দেখতে পাবো না!

এই ভালো-লাগা, এই উষ্ণতা একটু পরেই মরে যাবে। বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ করে অ্যাকাউট্যান্সীর দমবন্ধ আবহাওয়ায় ভিরমি খাব আমি। সমস্ত সুখস্মৃতি, আবেশ, এই আশ্চর্য দিনটির মত নিভে যাবে।

দেখতে দেখতে স্টীমার এসে ঘাটে লাগল।

আমি আগে নামলাম না।

যতক্ষণ বুলবুলি না নামে, আমি নানা অছিলায় উপরের ডেকেই থাকলাম। তারপর এক সময় ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

এ-পাশে শামুকখোল, ও-পাশে হুতোম-পেঁচা, মধ্যিখানে

বুলবুলি। একটু যে ভাল করে শেষবারের মত তাকাব তারও উপায় ছিল না। ধাড়ি পাখিগুলো বুলবুলিকে আড়াল করে ছিল।

ও-ও যেন কি? ও কি বুঝতে পারে না, আমার ওকে কতখানি ভাল লাগে, আমি ওকে একটু দেখতে পেলে কতখানি খুশী হই? তা নয়, আমাকে দেখলেই ওর চোখে বিরক্তি, মুখে নিমপাতা। একদিনও ও আমার দিকে ভাল করে চোখ মেলে তাকাল না পর্যন্ত।

কিন্তু আজকে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল।

শ্যামলদার পাশে বসে গান শুনতে শুনতে আমি বাইরে জলের দিকে চেয়েছিলাম। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সামনে তাকাতেই দেখি, ও পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি চোখ ফেরাতেই ও আবার বিরক্ত চোখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ও কি তাহলে আমার অজানিতে আমার চোখে চেয়েছিল? ওরও কি আমার দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে?

ও যখন স্টীমার থেকে জেটিতে নামল তখন আমি ওর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

উঁচু থেকে নামতে গিয়ে ওর শাড়ি একটু উঠে গেল। পিছন থেকে ওর সুগৌর পায়ের আভাস পেলাম, হলুদ আর লাল ধনেখালি শাড়ি ও সাদা পেটিকোটের নীচে।

হঠাৎ স্টীমারের বন্ধ-হওয়া এঞ্জিনটা স্টীমার ছেড়ে এসে আমার বুকের মধ্যে চলতে শুরু করল। এমন প্রচণ্ড ধ্বক-ধ্বক করতে লাগল বুকটা যে, মনে হলো আমি হার্টফেল করব।

সুন্দরী রুমা তো কতদিন শর্টস পরে আমার সঙ্গে ওদের বাড়ির লনে টেনিস খেলেছে—কতদিন। কই? তার অনাবৃত উরু, ফ্রেড-পেরী গেঞ্জীর নীচে সুবদ্ধ তার সুডৌল বুকের স্পষ্ট আভাসও তো আমার বুকের মধ্যে কাউকে এমন করে কথা বলায়নি? তবে? তবে বুলবুলির গোড়ালি আর গোড়ালির উপরের একটু অংশ দেখে আমার বুকের মধ্যের সমস্ত হলুদ-বসন্ত পাখিগুলো এমন করে ডানা আছড়াল কেন?

॥ ৭ ॥

অভিজিৎ ফোন করেছিল।

বলল, কাল ওদের বাড়িতে বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব গাইবেন, যেন অবশ্য অবশ্য যাই। রুমা বার বার যেতে বলেছে।

অভিজিৎ কলেজে সায়ান্সের ছাত্র ছিল। কিন্তু বলতে গেলে আর্টসের ও সায়ান্সের ছেলেদের মধ্যেই আমার বেশীর ভাগ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল।

অভিজিৎ মেটালার্জী নিয়ে পরীক্ষা পাশ করে কানাডায় যাবার তোড়জোড় করছিল। ও উজ্জ্বল চোখে বলত, জাস্ট ইমাজিন কর, একটা অত বড় সম্ভাবনাময় দেশ পড়ে আছে, জাস্ট ফর ইওর টেকিং। যে জীবনে চ্যালেঞ্জকে দাম দেয়, যে নিশ্চিত সুখের জীবনের চেয়ে অনিশ্চিত সংগ্রামের জীবন বেশী পছন্দ করে, তার পক্ষে কানাডা একটা আশ্চর্য জায়গা।

অভিজিতের বাবা কলকাতার নাম-করা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ছিলেন। এঞ্জিনীয়ারিং-এ ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করার পর, হাওড়ায় ছোট্ট একটি কারখানা দিয়ে জীবন শুরু করে, জীবনের দুই-তৃতীয়াংশে এসে, একজন মানুষ টাকা-পয়সা ও যশের ক্ষেত্রে জীবনে যা যা চাইতে পারেন, তার সব কিছুই উনি পেয়েছিলেন।

অভিজিৎ ওর বাবার একমাত্র ছেলে।

অথচ ও ওর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কখনও রাজী ছিল না। এ নিয়ে ওর সঙ্গে ওর বাবার প্রায়ই আলোচনা এবং মতদ্বৈধতা হতো। অভিজিৎ খুব একরোখা ছিল। ও বলত, তোমার কোম্পানীগুলোর আমি এমনিতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে যাব—জাস্ট বিকজ আমি তোমার ছেলে।

যদি আমি তোমার চেয়েও অনেক ভাল করি, তবে তুমি, মা, কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং পৃথিবীসুদ্ধু লোক বলবে, আরে, বাবার তৈরী কারখানা ছিল, সবই তো বাবার করা, ও আর কি করেছে ? বাবার গদীতে সকলেই বসতে পারে। আর যদি খারাপ করি তো বলবে, বাবার হাতে-গড়া এমন জিনিসটা বাঁদরটা তছনছ করে দিল !

আমি যদি কৃপণ হই তো বলবে, বাবার টাকা হাতে পেয়েছে, নিজের তো রোজগার করতে হয়নি ; ওয়ান-পাইস্ ফাদার-মাদার।

যদি খরচা করি খুব, তাহলেও বলবে, ওর আর কি ? নিজের পরিশ্রমে তো রোজগার করতে হয়নি, বাবা রেখে গেছিলেন, এখন দু'হাতে ওড়াচ্ছে বকাটা।

অভিজিৎ বলত, দ্যাখ, আমাদের একটাই জীবন, জীবনটা নিজের মত, নিজের খুশী মত, নিজের তৈরী করা সুখ, নিজের তৈরী করা দুঃখ নিয়েই কাটানো উচিত। নিজের জীবনে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, সে সুখেরই হোক কি দুঃখেরই হোক, নইলে জীবনের কোনো মানে নেই। বাবার পরিচয় আমাকে সমস্ত জীবন আমার নিজের যা-কিছু নিজস্ব সব কিছুকে আড়াল করে রাখবে, এ আমি ভাবতে পারি না। যদি জীবনে সাকসেসফুল হই তো বলব যে, আমি নিজে করেছি, যদি না হই তো স্বীকার করব নিজের দোষে হেরেছি।

অভিজিতের পরের বোন রুমা আমার কাছে এক দারুণ নরম বিস্ময় ছিল।

গভর্নেসের হাতে মানুষ, ইংরিজী ও ফ্রেঞ্চ অনর্গল বলতে পারত, সংস্কৃতে মূল মেঘদূত পড়ে শোনাত আমাদের। রুমা দেখতে এমন মোম-মোম পবিত্র-পবিত্র ছিল যে, ওকে দেখলেই মনে হতো আমিও পবিত্র হয়ে গেলাম।

ওর ধবধবে ফরসা রঙে কোনো উগ্রতা ছিল না, একটা শান্ত স্নিগ্ধতা ছিল। একমাথা কালো কুচকুচে চুল, সুন্দর পরিচ্ছন্ন দাঁত, কথাবার্তা হাঁটা-চলা হাসি সবকিছুর মধ্যে এক দারুণ

আভিজাত্য ছিল। যা নকল করে পাওয়া যায় না। ওর মধ্যে কোনো চালিয়াতিও ছিল না, যা রুমার দিদির মধ্যে ছিল।

বেশীর ভাগ সময়েই ও সাদা শাড়ি পরত, প্রসাধন করত না, চোখের মণির দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলত সরলভাবে। মেয়েদের সহজাত কোনোরকম ন্যাকামির 'ন'ও ছিল না ওর মধ্যে, কোনোরকম জড়তার 'জ'ও ছিল না।

রুমাকে আমার যে শুধু ভাল লাগত তাই-ই নয়, কেন জানি না, ও এত বেশী ভাল ছিল যে, ওকে আমার কেমন ভয় ভয় করত।

মা'র সঙ্গে বুলবুলি সম্বন্ধে সেদিন দুপুরে ওরকম কথাবার্তার পর আমি নিজেকে খুব শাসন করেছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম, তুমি বুলবুলিকে মন থেকে তাড়াও, এমনি না গেলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করো, আড়কাঠির ভয় দেখাও। তাকে বলো যে, সে যেন অমন করে গান না গায়, অমন করে না তাকিয়ে যেন একেবারেই না তাকায় তোমার দিকে।

মা যাই-ই বলুন না কেন, নিজের যাকে পছন্দ নয়, যাকে দেখিনি শুনিনি, যাকে জানি না, এমন কাউকে নেহাত মা-বাবাকে খুশী করার জন্যেই বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাছাড়া যে ছেলে ফেলুড়ে, যে একটা সামান্য পরীক্ষাই পাশ করতে পারছে না, যে নিজের পায়ে এখনও দাঁড়ায়নি, নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেনি নিজেকে নিজের কাছে, বাইরের কাছে, তার আবার বিয়ের ভাবনা কিসের!

তবু, এও সত্যি যে, মা-বাবাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে আমার কখনও ছিল না। তাই সেদিন অভিজিতদের বাড়ি যাবার সময় বার বার রুমার কথা মনে হচ্ছিল।

রুমাকে আমার মা ও বাবা দু'জনেই দেখেছেন। ওঁরা রুমার পরিবারের কথাও জানেন। তাই ভাবছিলাম, মনে মনে বুল-বুলিকে উড়িয়ে দিয়ে যদি রুমাকে মনের আরো কাছে আনি,

তাহলে হয়তো বাবা-মা খুশী হবেন।

কিন্তু তাও কি হবেন?

রুমাকে দেখার আগে আগে মা রুমার কথা শুনেছিলেন আমার কাছে। মাকে নিয়ে একদিন নিউ মার্কেটে গেছিলাম, সেদিন সেখানে রুমা ও রুমার মা'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম মা'র সঙ্গে।

ওঁরা চলে যেতেই মা বলেছিলেন, মেয়েটি ভারী সুন্দর তো! ওর বাবার নাম কি রে?

বাবার নাম বলতেই মা বলেছিলেন, ও মা! ভদ্রলোক তো প্রচণ্ড হুইস্কি খান। ক্যালকাটা ক্লাবে ওঁকে সকলে চেনেন। তোর বাবাও চেনেন। তারপরই মা বলেছিলেন, তুমি যা ক্যাবলা, দেখো, বেশী মাখামাখি কোরো না।

মা এই মাখামাখি বলতে কি বোঝাতেন জানি না, কিন্তু মা'র বোধহয় ধারণা ছিল, পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী গুণবতী মেয়েই তাঁর অপোগণ্ড ছেলের সঙ্গে মাখামাখি করবার জন্যে মুখিয়ে আছে। জানি না, হয়তো তাঁদের ছেলেদের সম্বন্ধে. ছেলেদের একটা বিশেষ বয়সে, সব মায়েদেরই এরকম ধারণা থাকে।

নিউ মার্কেটের দোকানেব সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনই বুঝেছিলাম যে, মা'র গুড-বুকে বেচারী রুমার নামটা উঠতে না উঠতেই কাটা গেল। তবে এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য। এখন রুমার নামটা বুলবুলির নামটার বদলে প্রার্থী তালিকায় বসালে, শুধু অন্যপক্ষকে হারাবার আনন্দেই মা রুমাকে হয়তো জিতিয়ে দিতে পারেন; বলা যায় না।

অভিজিতদের বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখি অনেক লোক এসে গেছেন। ফুটপাথের দু'পাশে আধ মাইল লম্বা গাড়ির লাইন।

অভিজিতের বাবা বললেন, এসো, এসো, এত দেরী করলে কেন?

মস্ত বড় হল-ঘর। কার্পেট পাতা। মেয়ে-পুরুষ সকলেই বসে আছেন। ধূপ জ্বলছে ঘরে। একটি ডিভানের উপর গায়ক বসবেন। দু'দিকে দুটি জোড়া-তানপুরা নিয়ে দু'জন বসে আছেন। তবলচি ওস্তাদ শান্তাপ্রসাদ যথেষ্ট পরিমাণে মঘাই পান ও বেনারসী জর্দা মুখে পুরে প্রথম সারিতে যে-সব চেনা পরিচিত লোক বসে আছেন, তাঁদের সঙ্গে জবজবে গলায় কথা বলছেন পান-মুখে।

আসরের পরিবেশ জমজমাট, কিন্তু খাঁ সাহেব আসেননি।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখনও ঘরে ঢুকিনি।

পেছন থেকে কে যেন এসে আমার হাত ধরল। বলল, তোমার ব্যাপারটা কি? হ্যাভেন্ট্ সীন উ সিন্স এজেস্।

রুমাকে বললাম, ভীষণ ব্যস্ত। পরীক্ষা।

ভাবলাম, জানলে রুমা কি মনে করবে যে আমি ফেল করেছি, কি খারাপই ভাববে আমাকে!

পরক্ষণেই মনে হলো ওর সঙ্গে আমি মিথ্যাচার করছি।

তাই সঙ্গে সঙ্গেই হেসে বললাম, তুমি জানো না? আমি ফেল করেছি?

রুমা আমার চোখের দিকে তাকাল; বলল, দাদার কাছে শুনেছি, কিন্তু এ নিয়ে তুমি এত বিচলিত কেন?

বললাম, বাঃ, ফেল করলাম, বিচলিত হবো না?

রুমা আবারও হাসল। হাসলে রুমার মুখে কেমন একটা স্বর্গীয় ভাব ফুটে ওঠে।

বলল, আমার বুদ্ধি আছে বলেই আমি মনে করি। আমার কিন্তু মনে হয়, ফেল করার জন্যে তুমি একটুও বিচলিত নও, তুমি বিচলিত ফেল করার কারণটা নিয়ে। নইলে ফেল করার ছেলে তো তুমি নও!

আমি হাসলাম। কেন হাসলাম জানি না।

বললাম, আমি যে কী তা তোমার জানার কথা নয়। তোমার দাদা যদি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা কোনো ভাল ধারণা তোমার

মনে জন্মিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধ আমার নয়।

রুমা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর ঠোঁটের কোণে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠেছিল।

ও বলল, আমার নিজের সব ধারণাই আমার নিজের। আমার মতামত অন্যনির্ভব নয়।

তারপরই বলল, যাক, তুমি ভিতরে গিয়ে বসো। ঐ তো দাদা বসে আছে।

বলেই, দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, দাদা, এই দাদা, শোনো, এই ছাখো, রাজাদা এসেছে।

অভিজিৎ হাত নেড়ে ডাকল আমাকে। দেখলাম, আমাদেব অনেক বন্ধুরা ওখানে বসে আছে।

আমি ভিতরে ঢোকার আগেই রুমা বলল, গান শুনেই চলে যেও না কিন্তু রাজাদা। তোমার সঙ্গে অনেক গল্প আছে। আচ্ছা, দাদা কি তোমাকে বলেছে যে দাদাকে আমি গত ববিবার স্ট্রেইট-সেটে হারিয়েছি! তুমি তো আজকাল আসই না একদম টেনিস খেলতে? কেন আস না? ভয়ে? আমার কাছে হেরে যাবার ভয়ে?

আমার খুব বলতে ইচ্ছে করল, হেরে তো আছিই, হেরেই তো থাকি, সব বিষয়েই। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। হাসলাম শুধু।

ও আবার বলল, চলে যেও না কিন্তু।

আমি বললাম, আচ্ছা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, খাঁ সাহেবের পাত্তা নেই।

তাঁকে আনতে গাড়ি গেছে অনেকক্ষণ।

আরও প্রায় আধঘণ্টা পরে খাঁ সাহেব এলেন। দেখে মনে হলো, শরীর খুব অসুস্থ।

দু'জনে দু'পাশে ধরে তাঁকে এনে ডিভানে বসালেন।

খাঁ সাহেব মুখ নিচু করে বসে রইলেন। গোঁফ দুটো ঝুলে

রইল। মনে হলো, খাঁ সাহেবের মাথাটা এক্ষুনি বুঝি কোলে ঢলে পড়ে যাবে।

কানের পাশে জোড়া-তানপুরা বাজছিল। অনেকক্ষণ থেকে বেজেই যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে যে গুঞ্জরণ উঠেছিল খাঁ সাহেবের অসুস্থতা দেখে, তা প্রায় থেমে এসেছিল।

ওস্তাদ শাস্তাপ্রসাদ দু' বগলের নীচে দু'হাত দিয়ে বসে এক-দৃষ্টিতে খাঁ সাহেবের মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

এমন সময়, সেই মুখ-নিচু-করা অবস্থাতেই খাঁ সাহেব যেন অন্য কোনো মুগ্ধ বিমূর্ত জগৎ থেকে বললেন, সা···।

কী বলব, স্বরসপ্তকের সেই প্রথম সুরের ছোঁয়ায় আমার এবং উপস্থিত সকলের বুকের মধ্যে কোথায় যেন কোন তারের সঙ্গে কোন তারের যোগাযোগ ঘটে গেল।

ভালো লাগায় সেহ মুহূর্তে আমরা সকলেই মরে যেতে বসলাম। বুকের মধ্যে আনন্দের আলোর ফুলঝুরি ঝরতে লাগল।

তারপর আলাপ শুরু করলেন খাঁ সাহেব।

মিঙাকি-টোড়ি গাইবেন উনি।

গান্ধারটা এমন ভাবে লাগালেন যে, আমার সমস্ত মন একটা গন্ধরাজ ফুল হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে আলাপ চলল।

ওখানে বসে মনে হচ্ছিল, আলাপই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মৃগনাভি; আলাপের মত এমন মন্থর, এমন গায়কের হৃদয়-নিংড়ানো ও শ্রোতার হৃদয়-মথিত করা অনুভূতি আর কিছুই নেই।

এক সময় খাঁ সাহেব আলাপ শেষ করে তানে এলেন।

তারপর তান বিস্তার করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর আমার মনে হলো, সুরের অনেকগুলো হলুদ হরিণ যূথবদ্ধ হয়ে এই ঘরের মধ্যেই ঘুমিয়েছিল। অথচ আমরা কেউই তা জানিনি। হঠাৎ তারা ঘুম ভেঙে উঠে আমাদের মনের আমলকী বনে দারুণ এক ক্ষণিক খেলায় মেতে উঠল।

কখনও বা মনে হতে লাগল, একরাশ শুধ্‌লি রাজহাঁস বালিয়াড়ি ছেড়ে এক সঙ্গে চিঙ্কার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কখনও বা এত কষ্ট হতে লাগল, মনে হতে লাগল আমার বুকের মধ্যে কখন অনবধানে বুঝি বুলবুলি মরে গেছে।

ঝোলানো গোঁফের পাহারা-ঘেরা মুখ থেকে আর বিশাল ঐ পেটের মধ্যবর্তী নাভিমূল থেকে যে অমন পাগল-করা নিখাদ নাদ বেরোতে পারে, তা এমন সামনে বসে না শুনলে কখনও জানতে পেতাম না।

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ যে অন্য এক জগতে বাস করছিলাম জানি না।

স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে এইরকম কোনো গায়কের সুরের সিঁড়ি বাওয়া এই পবিত্র পরজ অনুভূতিতেই আছে। দুঃখ এইটুকুই যে, এ জগৎ থেকে বড় তাড়াতাড়ি নির্বাসিত হতে হয়।

গান শেষ হলে গুচ্ছ গুচ্ছ মেয়ে-পুরুষ ঘর থেকে বেরোতে লাগলেন, বেরিয়ে লনে এলেন।

খাঁ সাহেবও লনে এসে একটা বড় ইজিচেয়ারে বসলেন।

রুমা বেয়ারাদের সঙ্গে করে মিষ্টির থালা, পানের থালা নিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে লাগল।

সবুজ লনের মধ্যে সাদা শাড়ি পরা সুন্দরী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রুমাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। মিঙাকি-টোড়ির রেশ, রুমার নৈকট্য, সব মিলিয়ে আমার কেমন নেশা ধরে গেছিল।

রুমা আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

হোলির ক্লাসিক্যাল ছবিতে শ্রীরাধিকার সখীরা যেভাবে ফাগের থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতেন, রুমা তেমনি ভঙ্গীমায় আমার সামনে এসে দাঁড়াল, মিষ্টির থালা হাতে করে।

কথা বলল না কোনো। শুধু চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি মাথা নাড়লাম।

রুমা আদেশ করল, বলল, একটা নাও।

একটা মিষ্টি তুলে নিলাম।

রুমা বলল, তুমি যেও না কিন্তু। তুমি আমাদের সঙ্গে খেয়ে তারপর যাবে।

যাঁরা শুধু গান শুনতেই এসেছিলেন, তাঁরা মিষ্টি ও পান খেয়ে এক এক করে চলে গেলেন। বাকি থাকলেন ওদের বাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন।

রুমা আমার কাছে এসে একটু পরে বলল, বাবাঃ, কর্তব্য শেষ হলো। চলো, এবার তোমার সঙ্গে গল্প করা যাক।

রুমা আমাকে নিয়ে একেবারে ওর ঘরে এসে হাজির হলো।

বলল, এক মিনিট বসো, হাতটা ধুয়ে আসি।

রুমার পড়ার টেবিলে একটা ব্যোদলেয়ারের কবিতার বই খোলা ছিল, পাশেই একটা খোলা খাতায় ইংরিজীতে কি সব লিখেছে দেখলাম। খুব অবাক লাগল যে, সেই ইংরিজী লেখার মধ্যে এক জায়গায় বাংলায় লিখেছে—

"তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ,
আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।"

রুমা বাথরুম থেকে বেরোলে, শুধোলাম, কি লিখেছ খাতায়।

রুমা প্রথমে অবাক হলো, তারপরই ওর সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে গেল লজ্জায়। বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য। আমার খাতা দেখলে কেন?

আমি বললাম, আমি কি আর ইচ্ছে করে দেখেছি? খোলা ছিল, চোখে পড়ল।

তারপরেই বললাম, কিন্তু সে কে? কে সে?

রুমা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বলব না।

সে কি নিজে জানে?

রুমা আমার দিকে মুখ ফেরাল। এক আশ্চর্য অভিমানে ওর চোখ দুটি ছেয়ে গেল; বলল, সে জানলে আর দুঃখ কি ছিল?

একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে একটা রেকর্ড শোনাব। আমার এক প্রিয়সখীর। স্কুলে আমরা এক সঙ্গে পড়তাম। তারপর আমি গেলাম লোরেটোয়, আর ও গেল শ্রীশিক্ষায়তনে। কিন্তু আমরা এখনও বন্ধু আছি। ওর নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে।

আমি ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে বললাম, নাম কি?

রুমা কেটে কেটে নাম বলল, বুলবুলি।

তারপর আমার মুখের দিকে না চেয়েই বলল, এল না যে কেন জানি না! ওকেও আজ গান শুনতে আসতে বলেছিলাম। তুমি যে আসবে, তাও বলেছিলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার কথা ওর সঙ্গে কি হলো?

রুমা বলল, 'দেশে' তোমার একটা কবিতা বেরিয়েছিল গত সপ্তাহে, তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি বুলবুলিকে বলেছিলাম যে, তোমাকে আমি বিশেষভাবে চিনি, তোমার যে আরও কত গুণ, সব ফলাও করে ওকে বলছিলাম, তোমার হাতে যে কি দারুণ দারুণ ব্যাকহ্যাণ্ড স্ট্রোকস্ আছে তাও।

আমি বললাম, তুমি কি এ পর্যন্ত আমার টেনিসের ব্যাকহ্যাণ্ড স্ট্রোকস্‌গুলোকেই একমাত্র গুণ বলে জেনেছ? আমার যে সব ফোরহ্যাণ্ড গুণ আছে সেগুলো বুঝি কখনও চোখ চেয়ে দেখনি?

রুমা বলল, তুমি বড় ইন্টারাপ্ট করো, শোনো যা বলছি। ওকে আমি বলেছিলাম যে, তোমার প্রীতিধন্য আমি। বলো, ভুল করেছি? অন্যায় করেছি কোনো?

আমি কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। চুপ করে ছিলাম।

রুমা আবার বলল, বুঝলে রাজাদা, ও কিন্তু একেবারে হেড ওভার হিল্‌স্। তুমি নাকি ওদের স্কুলে কি থিয়েটার করেছিলে, তার গল্পে একেবারে পাগল। তুমি তো বেশ! আমাকে কি একটা কার্ড দিতে পারতে না?

. আমি বললাম, তোমার মত মেমসাহেব যে বাংলা থিয়েটার দেখতে যাবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

ও বলল, ঠিক আছে। তবে তোমার জানা উচিত যে, আমি যাই-ই হই, আমারও একটা মন বলে জিনিস আছে, সেটা অন্য যে কোনো মেয়েরই মত। বুলবুলিরই মত। বাইরেটা হয়তো আলাদা আলাদা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সব মেয়েরাই একরকম।

আমি বললাম, জানি না। তা, তুমি কি বুলবুলির কথা বলবে বলেই আমাকে ডেকেছিলে?

রুমা যেন হঠাৎ ধাক্কা খেল।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলল; বলল, না, শুধু সে জন্যেই নয়।

তারপর বলল, বুলবুলির গান শোনো। বলেই, রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ডটা চাপাল।

গান শেষ হলে বলল, ভাল লাগল?

আমি মুখ নিচু করেই বললাম, আমি ওর গান খালি গলাতেও শুনেছি, ও সত্যিই ভাল গায়।

রুমা রেকর্ডটা যথাস্থানে তুলতে তুলতে বলল, কথাটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবো। কেমন?

রুমার গলাটা হঠাৎ ভারী শোনাল। বলল, আমি যদি বুলবুলির মত গান জানতাম, তবে কী ভালোই না হতো!

আমি বললাম, তুমি যে কত কিছু জানো, তোমার মত গুণ ক'জন মেয়ের থাকে? গান নাই-ই বা জানলে।

রুমা বলল, না। তুমি বুঝবে না। আমার কথা তুমি বুঝবে না।

বললাম, তাহলে বুঝব না!

রুমা হঠাৎ বলল, তুমি পরীক্ষায় ফেল করলে কেন?

আমি রুমাকে বুঝতে পারছিলাম না। কোথায় ও নিয়ে যেতে চায় আমায়, আমাকে দিয়ে কি বলিয়ে নিতে চায়!

আমি বললাম, পরীক্ষায় অন্য সবাই যে কারণে ফেল করে, সে কারণেই করেছি। পাস করার মত যথেষ্ট ভালো নই বলে করেছি।

রুমা বলল, আসল কারণটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। তোমার ফেল করার এটা সত্যি কারণ নয়।

তুমি যদি জানোই তবে আর জিগ্‌গেস করছ কেন?

রুমার গলায় আগুনের আচ লাগল, বলল, জানি, মানে জানি বলেই তো আমার ধারণা। তবে জানাটা সত্যি না মিথ্যে তাই যাচাই করে নিচ্ছিলাম।

আমি বললাম, তুমি কি ঝগড়া করবে বলেই আজ আমাকে ডেকে এনেছিলে?

রুমার চোখ দু'টি হঠাৎ ঘুঘুর বুকের মত নরম হয়ে গেল। ও বলল, হ্যাঁ। তুমি দেখো, তোমার সঙ্গে আমি চিরদিন ঝগড়া করব। তুমি পালাতে পারবে না কোনো ক্রমেই।

আমি বললাম, না। তুমি ঝগড়া করবে না। তুমি আমার কাছে কত দামী তা তুমি জানো? তোমাকে আমি কি চোখে দেখি তুমি কখনও তা জানার চেষ্টা করেছ? বিশ্বাস করো রুমা, তোমার মত বন্ধু আমার একজনও নেই।

বন্ধু? শুধুই বন্ধু বুঝি আমি তোমার, রাজাদা? আর কিছুই নই?

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, রুমা, তুমি সব দিক দিয়ে আমার চেয়ে ভাল। আমি একটা বাজে ফেলুড়ে ছেলে। প্লিজ, তোমার মনে মনে অন্য কিছু কল্পনা করে নিজে কষ্ট পেও না, আমাকেও কষ্ট দিও না। বিশ্বাস করো রুমা, তোমাকে বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই আমার। কোনোদিক দিয়েই আমি তোমার যোগ্য নই।

রুমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর সমস্ত সুন্দর শরীর কাঁপিয়ে অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, রাজাদা, তুমি একটা ইনসিপিড; ওয়ার্থলেস্ ছেলে। তুমি পুরুষ নও। তুমি জীবনে কখনও কোনো মেয়ের ভালবাসা পাবে না। অন্য সব কিছু পাবে; ভালোবাসা পাবে না।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমি যা বললাম তা তোমার ভালোর জন্যে! তোমার কাছ থেকে কোনো পুরুষত্বের সার্টিফিকেটের আমার দরকার নেই। সার্টিফিকেট বুকে ঝোলালেই কেউ পুরুষ হয় না, জীবনের সব ক্ষেত্রেই পুরুষত্ব প্রমাণ করার জিনিস।

রুমা কথা ঘুরিয়ে বলল, তুমি খেয়ে যাবে না?

আমি বললাম, না। আজ নয়।

রুমা রাগের গলায় বলল, তাহলে তুমি চলে যাও।

বললাম, যাচ্ছি।

রুমা দরজা অবধি এসে আমার পাঞ্জাবির কোণাটা চেপে ধরল।

আমি অবাক হয়ে পিছন ফিরে বললাম, ওকি?

রুমা বলল, তুমি আর কখনও আমাদের বাড়িতে আসবে না। আমার সামনে আসবে না। এক মুহূর্তের জন্যেও না।

আমি অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

এক সময় ওর হাত আলগা হয়ে গেল আমার পাঞ্জাবি থেকে।

ঘরের মধ্যে একরাশ হলুদ আলোর মধ্যে সাদা শাড়িতে সজ্জিত একটি একলা রজনীগন্ধার মত রুমা দাঁড়িয়েছিল।

আমি সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে এলাম।

পথে বেরিয়ে ভাবছিলাম, রুমা ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা ফুলের মত। আমার জীবন রঙ্গন, যুঁই, কাঠগোলাপের।

ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা রাখার মত ফুলদানী আমার নেই। যে মেয়ে ছোটবেলা থেকে এয়ারকণ্ডিসানড্ ঘরে, এয়ারকণ্ডিসানড্ আবহাওয়ায় মানুষ, যে গভর্নেসের কাছে বড় হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন সুখের একঘেয়েমিতে যে পীড়িত, তাকে সুখে রাখার মত সামর্থ্য তো আমার নেই, কখনও হবেও না।

ও মহানুভব। ওর সুন্দরী নিষ্কলুষ সরল মনে ও আমাকে ভালোবেসেছে—সেটা ওর উদারতা। সেটা আমার সৌভাগ্য।

কিন্তু কোনোদিক দিয়েই ওর যোগ্য নই, এ কথা মনে মনে ভালভাবে জেনেও আমি কি করে ওর এই ভালবাসা গ্রহণ করি ?

ভালবাসা গ্রহণ করতে দোষ নেই, কিন্তু জীবনে ওকে গ্রহণ করাটা আমার পক্ষে নীচতা হবে।

ও ছেলেমানুষ। ওর ছেলেমানুষী সরল মনে ও যা ভাল বলে জেনেছে তা-ই ও সরলভাবে চেয়েছে। তা বলে আমি জেনেশুনে ওকে ঠকাতে পারি না।

তাছাড়া সত্যি বলতে কি, বুলবুলিকে দেখার আগে আমি হয়তো রুমার প্রতি আমার অনুভূতি যেমন ছিল, তাকেই ভালবাসা বলে জানতাম। কিন্তু আজ আমার মত করে আর কেউই জানে না যে, ভালোবাসা অনেক গভীরতর বোধ। এ কোনোই হিসাব-নির্ভর নয়। এই ক্ষেত্রেই পৃথিবীর তাবৎ অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নিদারুণ হার।

রুমার ব্যাপারে ভাবাভাবির অবকাশ আছে, কিন্তু বুলবুলির ব্যাপারে নেই।

লোহা যেমন চুম্বকের দিকে স্বাভাবিক নিয়মে আকর্ষিত হয়, পূর্ব সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে যেমন ঝোড়ো হাওয়া স্বভাবসিদ্ধ কারণে ওঠে—তেমন স্বাভাবিক ও অনিবার্য কারণে আমি বুলবুলিকে ভালবাসি। তাকে দেখলে আমার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখানে রবিশঙ্করের সেতারের ধুন্ বাজতে থাকে।

তার গান শুনলে আমার ক্ষিদে পিপাসা ঘুম সব চলে যায়।

তাকে না দেখতে পেলে আমার কিছুই ভাল লাগে না। তার ভাবনা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনাতে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও মনোসংযোগ করতে পারি না। তার প্রভাব আমার উপরে সর্বনাশা। অথচ তার চেয়ে বেশী স্নিগ্ধ বিভাসিত হংসধ্বনি রাগের প্রভাব আর কিছুই হতে পারে না।

রুমাকে আমার ভাল লাগে, আমার মনের অবসরের পরিসরে সে আমাকে এক স্নিগ্ধ আবেশে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু বুলবুলিকে আমি

না ভালোবেসে পারি না। সে আমার সমস্ত মন সর্বক্ষণ এক উদ্দাম উগ্র কানীন কামনায় ভরিয়ে দেয়—সে আমার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাতঙ্গিনীর মত ম্যারাকাস্ বাজায়।

রুমাকে না পেলে আমি অখুশী হব; কিন্তু আমার বুলবুলিকে না পেলে আমি বাঁচব না।

কোনো বুদ্ধি দিয়ে আমার এই ভাবনার ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ কখনও আমি বুদ্ধিনির্ভর ছিলাম না; জন্ম থেকেই আমি একমাত্র ও একান্ত হৃদয়-নির্ভর।

॥ ৮ ॥

সেদিন স্কুলে শুনলাম, বিজুদার দাদা, মানে বুলবুলির বাবা হঠাৎ মারা গেছেন।

ঈস্, বেচারীর কি কষ্ট! আমি তো ভাবতেই পারি না যে, আমার বাবা নেই।

অথচ ও কষ্টের সময় ওর কাছে গিয়ে যে একটু সান্ত্বনা দেবো তারও তো কোনো উপায় নেই; আমি তো ওর কেউ নই।

আমি শুধু বাড়ি বসে ওর জন্যে, ওর কষ্টে কষ্ট পেতে পারি। এইটুকুই।

দেখতে দেখতে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী এসে গেল। অনেকদিন আগে থেকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ হচ্ছে। স্কুলের পাশের বড় পার্ক জুড়ে মেলা বসল। মঞ্চ তৈরী হলো নানা অনুষ্ঠানের জন্যে।

লোকে বলত লাগল, এই দেশজোড়া শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পরই রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৃত্যু হবে। এই নাকি শেষ উজ্জ্বলতা, প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে।

পঁচিশে বৈশাখ সকালবেলায় বুলবুলির গান ছিল।

গান শুনতে গেলাম। ও গাইল—'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে।'

গানটা টপ্পার কাজে ভরা—খুব খেলিয়ে গাইল বুলবুলি।

ও গান গাইছে হাজার লোকের মাঝে, সকালের আলো পড়েছে ওর নরম কালো চুলে, ওর প্রেমের মুখে, ক্ষণে ক্ষণে রোদের রঙের সঙ্গে ওর সুরের এবং মনের রঙ বদলাচ্ছে।

সামনে থেকে কে একজন গান শুনে বললেন, আহা!

হায় রে, তুমি যদি জানতে বুলবুলি, সেই মুহূর্তে গায়িকা হয়ে

হাজার লোকের প্রশংসা পাওয়ার সুখ, যে সেই গায়িকার গোপন ভালবাসা পেয়েছে তার সেই সুখের কাছে কী অকিঞ্চিৎকর !

সেদিন থেকে মেলায় রোজ যেতাম। মেলায় নাগরদোলা চড়তে বা স্টল দেখতে নয়; বুলবুলিকে কোথাও না কোথাও দেখা যেতই বলে। মেলার ভীড়ে ঘুরতে ঘুরতে ভাবতাম, এ মেলায় কত লোক এসেছেন, কত নারী কত পুরুষ—কিন্তু কে যে কিসের টানে এসেছেন তা প্রত্যেকে নিজে ছাড়া অন্য কেউই জানে না।

ইতিমধ্যে মা একদিন বললেন, শুনেছ, তোমার গায়িকা শ্যামলদের বাড়ি এসেছিল গান শোনাতে। শ্যামলের সঙ্গে নাকি ওর সম্বন্ধ-এসেছে।

শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

শ্যামল আমাদের আগের পাড়ার ছেলে। দেখতে বোকা-বোকা ভাল। ওর কথা শুনলে মনে হয় রামছাগল কথা বলছে। বাবা বড় কনট্রাক্টর। নিজে লেখাপড়া মোটেই করেনি। বাড়ি ভাড়ার পয়সায় দিব্যি আরামে দিন কাটিয়ে দেবে বলে বোধহয় ও সাব্যস্ত করেছিল। ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে আর্টিফিসিয়াল হাসি হাসত, সুগন্ধি পাউডার মাখত মুখে এবং মেয়েদের স্কুল-কলেজের সামনে ইমপোর্টেড লেফট-হ্যাণ্ড-ড্রাইভ গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ওর রুচি ও ভাষাজ্ঞান অদ্ভুত ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেও কখনও দু'মিনিটের বেশী কথা বলতে পারিনি। বোধহয় ওর এবং আমার মনের ওয়েভ লেংথে বিস্তর ব্যবধান ছিল। ও যা বলত আমি বুঝতাম না, আমি যা বলতে চাইতাম ও-ও তা বুঝত না। ওর সঙ্গে আমার কম্যুনিকেশান বা কম্যুনিকেশানের প্রয়োজনীয়তাও ছিল না।

বুলবুলি আর জায়গা পেল না?

যে আমার ভালবাসা পেয়েছে, যাকে আমি আলাপিত-না-হয়েই প্রাণ-মন সব সঁপে বসে আছি, সে আমাকে অপমান করার কি অন্য কোনো পথ খুঁজে পেল না? আমাকে মায়ের কাছে, আমার

নিজের কাছে এমন করে ছোট করে তার কি লাভ হলো?

মা ফরেন সার্ভিসের লোকের মত মুখে আমাকে কিছুই আর বললেন না। খবরটা দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। ভাবটা, ছাখো, তোমার স্বয়ংবরসভার প্রতিযোগীরা কি রকম?

আমি কি করব ভেবে পেলাম না।

বুলবুলিকে কাছে পেলে তার ঝুঁটি ও সব পালক ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। অথচ আমার জানার উপায় নেই কোনো যে, ব্যাপারটা সত্যি কি ঘটেছিল! এবং এর পিছনে ওর নিজের মত এবং ইচ্ছা ছিল কতখানি তাও খুব জানতে ইচ্ছা করছিল।

যত দিন যাচ্ছিল, আমি মনে মনে বুঝতে পারছিলাম, বুলবুলির বাসায় ঢুঁ না দিতে পারলে, তাকে আড়কাঠি দিয়ে ধরতে না পারলে আমার এ জীবনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া হবে না। কবি হওয়াও হবে না। আমার কিছুই হওয়া হবে না।

বুলবুলিকে চাওয়া নিছক একজন গায়িকাকে চাওয়া নয়, একটি সুন্দরী দারুণ ফিগারের নারীর শরীরকে চাওয়া নয়। বুলবুলিকে চাওয়া মানে নিজের আয়নাকে নিজের ঘরের দেওয়ালে এনে বসানো। সে আমার দর্পণ।

সে নইলে আমি মিথ্যা, প্রতিবিম্বহীন; অপরিপ্লুত।

আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না, বুলবুলিকে আমি চাই। তাকে আমি যে-কোনো মূল্যে চাই। এমন কোনো অশুভ নক্ষত্র নেই সৌরজগতে, এমন কোনো শক্তি নেই যা আমার এই পাওয়াকে মিথ্যা করতে পারে। বুলবুলি, তুমি অমল, কমল বা শ্যামলের বাড়ি গানই গাও আর পেয়ারা গাছে উড়েই বেড়াও, তুমি জেনো যে তুমি আমার। আমার তুমি চিরদিন ছিলে; আছ; এবং আমি যতদিন বাঁচি আমারই থাকবে। তুমি আমার হৃদয়ে এসেছ; হৃদয়ে থাকবে।

তোমার সঙ্গে কয়েকদিন তো চোখে চোখে কথা বলেছি; মুখে নাই-বা বললাম। যা অনেক কথা দিয়ে বোঝাতে পারতাম

না, যা অনেক খণ্ড উপন্যাসে বলা যেত না, তা আমার সরল বক্তব্যে ভরা নীরব চোখের ভাষায় বলেছি।

আর তুমিও তো তাই বলেছ বুলবুলি। তোমাকে নিশ্চয়ই প্রকাশিত করেছে, তোমার বিরক্ত ভুরু, তোমার ভয় পাওয়া চোখ বার বার তোমাকে আমার কাছে প্রকাশিত করেছে। তুমি ধরা পড়ে গেছ আকাশের পাখি, বড় নিদারুণভাবে ধরা পড়ে গেছ অন্য একটা পাখির কাছে। তোমার একমাত্র মুক্তি এখন এক সুগন্ধি বন্ধনে। এই ভাবনায় তোমার দু'চোখ ছটফট করে মরেছে, নীরব অব্যক্ত যৌবনের যন্ত্রণায় তুমি কেঁপে কেঁপে উঠেছ। তুমি জেনে গেছ, তোমার মুক্তি নেই এ জন্মে, আমার কাছ থেকে তোমার মুক্তি নেই।

আমিও জেনে গেছি বুলবুলি, যুবনাশ্বর সেই বিখ্যাত পংক্তির মত জেনে গেছি যে—"একই অস্ত্রে হত হবে মৃগী ও নিষাদ।"

আমার হঠাৎই মনে হলো ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। এই হেস্তনেস্তর উপরে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এক সঙ্গে দুটো সমস্যার সমাধান করা মুশকিল। বুলবুলি আমার খাঁচায় আসবে কি আসবে না, এটার ফয়সালা করা দরকার আগে। যদি আসে, তাহলে আমি পরীক্ষায় বসব আর পাস করব। যদি না আসে বলে নিশ্চিতভাবে জানি, তাহলে কি হবে বলতে পারি না। পরীক্ষায় ফার্স্ট'ও হতে পারি—অল-টাইম রেকর্ড করতে পারি অ্যাকাউন্ট্যান্সী পেপারে; নইলে, নইলে যে কী তা আমি ভাবতেও পারি না।

আমি ভাবতেও চাই না।

চিঠিটা অবশেষে লিখেই ফেললাম। মোট পাঁচবার লিখে পাঁচবার ছিঁড়ে ফেলে দিতে হলো। মাথার মধ্যে এত কথা জমে ছিল যে, তারা সুযোগ পেয়ে কলমের উৎসমুখে একই সঙ্গে উৎসারিত হতে চাইছিল। রাত প্রায় দুটো নাগাদ চিঠিটাকে শেষবারের মত লিখলাম। আমার আল্টিমেটাম।

বুলবুলি,

তোমাকে আমি যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন থেকেই তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন তুমি একজন বড় গাইয়ে হবে। আমি সমঝদার নই; তবু একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবেই, কেন জানি না আমার মন বলে, তুমি নিশ্চয়ই খ্যাত হবে।

তোমার সম্বন্ধে যা ভাবার, যা জানার তা আছে আমার মনের মধ্যে। ভগবান বিরূপ না হলে সেই সব জানাই যে সত্যি বলে একদিন প্রমাণিত হবে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

যে জন্যে এ চিঠি লিখছি, তা হলো এই-ই যে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।

কিন্তু তুমি কি আমাকে পছন্দ করো ?

তোমার পছন্দ অপছন্দ ঠিক করার আগে, আমি এর পরে যা লিখছি তা ভাল করে পড়ে নিও। আমাকে যেহেতু তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে, আমার সম্বন্ধে মনঃস্থির করার আগে, আমার সে যোগ্যতা আছে কি নেই, এ কথা তোমার প্রাঞ্জলভাবে জানা দরকার।

আমি জীবনে কারোই দয়া চাই না ; দয়া গ্রহণ করি না। তাই তোমার কাছে কোনোরকম দয়ার প্রত্যাশী আমি নই। দয়া বা করুণার ভিতরে যে সম্পর্কের শিকড়, সে সম্পর্কে শিগগিরি ফাটল ধরে। জোরে বাতাস উঠলেই সে সম্পর্ক উড়ে যায়।

আমি গ্রাজুয়েশানের পর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সীর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ও ফাইনালের 'ল' গ্রুপ পাশ করে অ্যাকাউন্টস্ গ্রুপের পরীক্ষা দিয়েছি। এবং ফেল করেছি।

বর্তমানে আমি আমার বাবার অফিসে চাকরি করি। দেড়শ' টাকা পাই। আমি যদি পরীক্ষা পাস না করতে পারি তাহলে আমার বাজার দর তিন-চারশ' টাকার বেশী হবে না মাসে। অর্থাৎ আপাততঃ আমার মাসিক অর্থকরী মান তিন-চার বস্তা আখের

গুড়ের সমান।

আমার বাবাকে অনেকে অবস্থাপন্ন বলে জানেন। বাবার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে অনেক, আর দায় আছে একটি; তা হচ্ছে আমি। সম্পত্তিটা বাবার, দায়টা আমার; আমার নিজের ;—একান্ত নিজস্ব।

এ কথাগুলো এ জন্যেই বলছি যে, আমার বাবার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেললে খুব বড় ভুল করবে।

আমি আমার জীবনে নিজের পরিচয়েই পরিচিত হতে চাই। যা-কিছু পাবার তা নিজের যোগ্যতা ও গুণপনাতেই পেতে চাই। বাবার কোনো কিছুর উপর আমার লোভ এবং দাবী নেই, প্রত্যাশা নেই কোনোরকম। যে-ছেলে বাবার সম্পত্তির ভরসায় বা তার বিনিময়ে নিজের জীবনে কিছু পেতে চায় ও পায়, আমি তার দলে নেই।

এ কথা আমার তোমাকে জানানো দরকার যে, আমাদের বাড়িতে যাদের মত প্রণিধানযোগ্য, তাদের তোমাকে পছন্দ নয়। অপছন্দর কারণটা আমার জানা নেই, জানা যাবেও না। তাই যদি তুমি আমার স্ত্রী হতে রাজী থাকো, তাহলে খুব সম্ভবত আমাকে বাবার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। ঐ মাইনেতে যে রকম বাড়িতে আমি থাকতে আশা করি, সে রকম বাড়িতে কি তুমি থাকতে পারবে? খুব কষ্ট করে, নিজ হাতে বাসনপত্র মেজেঘষে খেতে হবে হয়তো তোমায়। তুমি ভালভাবে আদরযত্নে মানুষ হয়েছ, তোমার তো কষ্ট করা অভ্যেস নেই।

আমার প্রতি তোমার কি মনোভাব জানি না। আমাকে তুমি জানার সুযোগও দাওনি, তবে যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে আমাকে তোমার ভাল লেগে থাকে, তাহলে শুধু আমার জন্যেই আমাকে ভাল লাগাতে হবে। আমার বাবার পটভূমির জন্যে নয়। এ কথাটা তোমার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা দরকার।

আমি জানি, তোমার মত গুণী মেয়ের অনেক স্তুতিকার আছে।

এও জানি যে, আমার চেয়ে সবদিক দিয়ে ভাল অনেক ছেলে তোমাকে পছন্দ করে। তবুও আমার মনে হলো, আমিও যে তোমাকে পছন্দ করি এ কথাটা তোমাকে এখন না জানালে হয়তো বড় দেরী হয়ে যাবে।

আমার আর কিছু লেখার নেই।

তোমার জবাব এই চিঠি পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে আমার অফিসের ঠিকানায় পোস্ট কোরো।

জবাব দেওয়ার আগে খুব ভাল করে ভেবে জবাব দিও।

আমার মধ্যে যদি ভালো লাগার বা সম্মান করার মত কিছু দেখে থাকো, আমার নিজের উপর এবং আমার ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের উপর যদি তোমার আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, তাহলেই 'হ্যাঁ' করো।

তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি

রাজা রায়।

চিঠিটা পড়লাম।

পড়েই মনে হলো, কোনো ব্যাটালিয়ানের অ্যাডজুট্যান্ট বুঝি কোয়ার্টার মাস্টারকে চিঠি লিখছে। কে বলবে একে প্রেমপত্র!

চিঠি লেখা শেষ করে রাত দুটোয় চান করে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

চিঠি তো লেখা হলো—কিন্তু এরকম সমর্পণী হাঁটু-গেড়ে বসা চিঠি ডাকে দেওয়া যায় না। এ চিঠি হাতেই দিতে হবে।

রোজই মেলায় যাই, বুলবুলিকে দেখতেও পাই, কিন্তু চিঠি দেওয়ার সুবিধে হয় না।

এক একদিন এক এক বাহারী শাড়ি পরে আসে ও। ওর দারুণ ফিগারে ও যাই-ই পরে, তাতেই ওকে খুব মানায়। শাড়ি পরার ধরন, জামার কাট্, ওর হেঁটে যাওয়ার সুন্দর ঋজু সুষম ভঙ্গী, সব আমার চোখে লেগে থাকে। যখন কখনও ওকে হঠাৎ একা পাই, বুনোবেড়াল যেমন সাবধানী পায়ে বুলবুলির বাসার দিকে

এগোয়, তেমন করে এগোতে থাকি। কিন্তু ও আমাকে দেখলেই ভূত দেখার মত চমকে ওঠে এবং ছুলোয়ার তাড়া-খাওয়া হরিণীর মত তীব্র বেগে পালিয়ে যায় কোনো ভীড়ের অভয়ারণ্যে।

ওর কাছে পৌছনো যায় না, ওর হাতে চিঠিটা দেওয়া যায় না।

চার-পাঁচদিন এই করে কেটে গেল। চিঠিটা খামের মধ্যে করে হিপ্-পকেটে রোজ ফেলে নিয়ে যেতাম। মে মাসের প্রচণ্ড গরম, তার উপর প্রায় সব সময় হাঁটার উপরেই থাকতাম, তাই খামটা রোজই ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠত। পাঁচদিনের দিন বাড়ি ফিরে চিঠিটা খুলে দেখলাম, চিঠির লেখা অনেক জায়গায় ঘামে চুপসে মুছে গেছে।

সেই চিঠিটা দেখে দেখে অন্য একটা চিঠি লিখতে হলো। অনেক জায়গায় বক্তব্য বদলে গেল।

মেলা শেষ হয়ে যাবে আর দু'দিন পর। আজ সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' ডকুমেণ্টারী ছবিটি মেলায় দেখানো হবে। ঠিক করলাম, আজই যে করেই হোক চিঠিটা দিতে হবে।

সেদিন ছবি শেষ হলো প্রায় রাত পৌনে দশটায়।

ছবি শেষ হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, বুলবুলি বাড়ি যাবে বলে এগোচ্ছে।

সেদিন ওর সঙ্গে আর কেউই ছিল না। এমনকি ওর চর ও অনুচর দীপাও ছিল না।

দেখলাম, ও ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়াল। বুঝলাম, ও ট্রামে চড়ে গড়িয়াহাটার মোড়ে যাবে এবং সেখান থেকে বাস কি ট্রাম চেঞ্জ করে ফাঁড়িতে গিয়ে নামবে।

তাড়াতাড়ি আমি একটা চলন্ত দু' নম্বর বাসে উঠে পড়লাম। বাস নিশ্চয়ই ট্রামের চেয়ে আগে যাবে।

গড়িয়াহাটার মোড়ে পৌঁছে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বাস স্টপেজে।

আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘের ছুলোয়াতেও আমার এত ভয় করে না। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি পারব না। চিঠিটা ওর হাতে দিতে পারব না।

এক সময় দেখলাম ও এগিয়ে আসছে। সেদিন ও একটা সাদা খোলের খয়েরি-পাড়ের টাঙ্গাইল পরেছিল। একটা খয়েরি ব্লাউজ। হাতে একটা খয়েরি ব্যাগ।

ও এসে বাস স্টপেজে আমাকে দেখেই চমকে উঠল। চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে রইল।

আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম। ওর সামনে দাঁড়ালাম।

ওর চোখে মুখে ভীষণ একটা আতঙ্কগ্রস্ততা ফুটে উঠল, যেন আমি কলুটোলার কোনো কুখ্যাত গুণ্ডা।

আমি চিঠিটা হিপ্-পকেট থেকে বের করে ওকে দিলাম।

ওর সঙ্গে কোনোদিনও কথা বলিনি, তবু সেই মুহূর্তে আমার নিজের গলা আত্মবিশ্বাসে এমন ভারী হয়ে উঠল যে, নিজেই চমকে উঠলাম।

বললাম, এতে একটা চিঠি আছে, ভাল করে পড়ে উত্তর দিও।

ও ব্যাগ-ধরা হাতে চিঠিটা নিয়ে অন্য হাতে কপাল থেকে চুল সরাতে লাগল।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, আমার পায়ের থরথরানি এখন ওর পায়ে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। ও বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, মুখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা।

আমি বললাম, উত্তর দিও কিন্তু।

ও আবারও বলল, আচ্ছা।

এর পরেই একটা বাস এসে গেল। ও উঠে পড়ল। আমার দিকে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। কোনো কিছু বলল না

আমাকে।

যতক্ষণ বাসের টেইল-লাইটটা দেখা যায়, আমি ঐখানেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

তারপর ধীরে ধীরে ভারমুক্ত মাথায় বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল যে, ন-মামার মত আমার যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, সব আমি একটা আন্‌ডিপেণ্ডেবল্ ঘোড়ায় লাগিয়ে এলাম এক দারুণ জ্যাক্‌-পটের আশায়। আমার ঘোড়া লাগলে আমি রাজা, সত্যিকারের রাজা। না লাগলে আমি সর্বস্বান্ত।

সেদিন সারা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, চিঠিটা পড়ে ও কি ভাবছে? কল্পনা করতে লাগলাম যে, ও বাড়ি গেল, তারপর গা-ধোওয়ার অছিলায় বাথরুমে গেল অথবা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আমার চিঠিটা খুলল।

তারপর?

তারপর যে কি হলো সেটাই আসল কথা।

তারপর কি হলো আমার জানার উপায় নেই কোনো। এখন তিন-চার দিনের তিতিক্ষা, প্রতীক্ষা; ধৈর্যের পরীক্ষা। সি-এ পরীক্ষার চেয়েও কঠিন।

প্রথম কাজ শেষ হলো। এর পর দ্বিতীয় কাজ।

বাবার চিঠিটা ইংরিজীতে লিখতে হলো। কারণ, বাবা বাংলা মোটে লিখতে পারতেন না। পড়তেও ভাল পারতেন না। তিনি চিঠি পেতে ও দিতে ইংরিজীটাই একমাত্র পছন্দ করতেন। এমন কি ঠাকুমাকেও তিনি ইংরিজীতে চিঠি লিখতেন বরাবর—যদিও ঠাকুমা তেমন ভাল ইংরিজী জানতেন না।

ইংরিজীতে চিঠি লিখতে একটা সুবিধা এই যে, যে-সব কথা বাংলায় বললে ঠিক বলতে পারা যায় না, ইংরিজীতে অকপটে তা বলে ফেলা যায়।

বাবাকে লিখলাম যে, আমি তোমার ছেলে হিসেবে কখনও তোমার সম্মানহানিকর কিছু করিনি। আমি অনেক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, সরল সহজভাবে। কিন্তু একজনকে ভীষণ ভালো লেগে যাওয়ার জন্যে শুধু তার সঙ্গেই মিশতে পারিনি। মেশা তো দূরের কথা, কথা বলতে পর্যন্ত পারিনি। সব সময় তার কথা আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করে। এ ব্যাপারের ফয়সালা না-হবার আগে আমি পরীক্ষা পাস করতে পারব না। কারণ আমি মোটেই মনোসংযোগ করতে পারছি না। অনেক চেষ্টা করেছি, পারছি না।

আমি সব ব্যাপারেই তোমাদের খুশী করতে চেয়েছি এ পর্যন্ত। তবে এই প্রথম তোমাদের আমার খুশীর কথা জানাচ্ছি। তবে তোমাদের খুশী ও আমার খুশী যদি এক না নয়, তবে তোমাদের খুশীই জিতবে। কিন্তু আমাকে মহাদেববাবুর মেয়ে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে বলবে না তোমরা। বিয়ে যদি করি তো একেই করব; নইলে কাউকেই বিয়ে করব না।

বিয়ের কথা এখন উঠছে না। যতদিন না আমি নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছি ততদিন বিয়ের কথা আমি ভাবছি না। তবে কাকে বিয়ে করব, এ ব্যাপারটার এক্ষুনি ফয়সালা হওয়া দরকার।

আমার এ চিঠি লিখতে খুব লজ্জা ও সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এটা এমন একটা ব্যাপার যার উপর আমার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ, আমার পড়াশুনা, কাজকর্ম সমস্তই নির্ভর করছে। তাই, নেহাত দায়ে ঠেকেই এ চিঠি লিখছি।

তুমি চিরদিন 'আদার ম্যান'স্ পয়েন্ট অফ ভিউ'কে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছ—তাই আশা করি তুমি আমার বক্তব্য বুঝবে। আমার সব কথা শুনে তুমি আমাকে তোমার সুচিন্তিত ও পরিষ্কার মতামত জানাবে। তোমার মত জানলে আমি তাকে জানাব। কারণ সে তো আমার জন্যে অনাদিকাল বসে থাকবে না। তাকে বিয়ে করার জন্যে অনেক লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার

কথা শুনে তারপর সে মন স্থির করবে।

আমি এ চিঠি না লিখলেও পারতাম, কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যে গান, সেই একিলিসের গোড়ালিতে সে মেয়ে তীর হেনেছে। আমার না-মরে উপায় নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চিঠিটা অনেক মোটা হয়ে গেল। ভারীও হয়ে গেল অনেক।

এবারে সমস্যা হলো চিঠিটা দেবো কি করে বাবাকে?

বাড়িতে দেওয়া চলবে না, কারণ বাড়িতে চিঠি পড়লেই, বাবার নিজের মতামত শোনার আগেই মা'র চোখের জল সে মতামতকে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত করে দেবে। যে বিবাদের মামলা এখনও সাবজুডিস্, সেই মামলার জজকে বায়াস্ড করে দেওয়া বাদী বা বিবাদী দু'পক্ষের পক্ষেই অন্যায়।

ঠিক করলাম, বাবার অফিসের টেবিলে চিঠিটা রেখে দেবো। শনিবার বাবার অফিসের টেবিলে চিঠিটা রেখে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যাব। তারপর যদি বাড়িতে আমার স্থান হয় তাহলে ফিরে আসব, নইলে আর ফিরব না।

শনিবার অফিসে গিয়ে কিছুতেই কাজে মন বসছিল না।

বাবা অফিসে এসেই কাজে বেরিয়ে গেলেন।

আমি এই ফাঁকে বাবার চেম্বারের প্রধান বেয়ারার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললাম, খুব জরুরী চিঠি; বাবা এলেই দিয়ে দিও।

চিঠিটি দিয়েই আমি পাততাড়ি গুটিয়ে সোজা চলে এলাম প্রদীপ্তদের বাড়ি। প্রদীপ্ত আমাকে লণ্ডন থেকে প্রায়ই চিঠি লিখত। অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হতে আমার আপত্তি ও অস্বস্তির কথা জেনে সে লিখত যে, প্রত্যেক মানুষের মনেই অনেকগুলো কুঠরি থাকে। নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা, তীব্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, জেদের দ্বারা আমরা সকলে ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন সত্তার মানুষ হতে পারি। আফটার অল্ আমরা তো মানুষ, কুকুর-বেড়াল তো নই আমরা?

ইচ্ছে করলে মানুষ কী না করতে পারে?

প্রদীপ্ত বার বার আমাকে উৎসাহ দিত; লিখত, মনের কুঠরিগুলোকে ওয়াটারটাইট করে নে, যাতে একটার জল অন্যটায় না গড়াতে পারে। তুই যখন অ্যাকাউউন্ট্যান্ট, তখন কট্টর ছিমছাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েই থাক্। আর যখন তোর সে ঘর থেকে ছুটি, তখন তুই তোর মূল মনে ফিরে যা। ঢিলেঢালা ভাবুক হয়ে যা, কবিতা লেখ, গান গা, ছবি আঁক; কেউ তোকে বারণ করবে না।

ও বলত, একই সঙ্গে দু'জন মেয়েকে যদি কেউ সিনসিয়ারলি ভালবাসতে পারে, একই সঙ্গে একাধিক বৃত্তি কেন গ্রহণ করতে পারবে না? আমাদের মনের ক্ষমতা কি এতই সীমিত? আমরা কি এতই সাধারণ? সাধারণই যদি হবি, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি? পৃথিবীর অনেক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের মত, যারা জাস্ট্ নিঃশ্বাস ফেলা ও প্রশ্বাস নেওয়ার জন্যে বাঁচে, যারা চাকরি পাবে বলে পড়াশুনা করে, বিয়ে করবে বলে চাকরি করে এবং সংসার-সংসার পুতুলখেলা খেলবে বলে বিয়ে করে, তাদের সঙ্গে আমার-তোর তফাতটা কি?

নানা কারণে প্রদীপ্তকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। আমার বন্ধুদের মধ্যে ও সবচেয়ে উজ্জ্বল ও স্বকীয় ছিল। 'ওর মনে মনে এমন এমন সব ভাবনা ও ভাব জাগত, যা অন্য লোকের চিত্তজগতে বিপ্লব ঘটাতে পারত।

প্রদীপ্তর চিঠিতে লেখা ওর কথাগুলো নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। নিজেকে বলতাম, চেষ্টা করব, সত্যিই চেষ্টা করব, যাতে একাধিক সত্তায় বেঁচে থাকতে পারি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই-ই যে, বর্তমানে আমার মনের সমস্ত কুঠরিগুলোতেই একটি করে বুলবুলি পাখি বসে আছে। এই বুলবুলির ঝাঁককে তাড়াতে না পারলে আমার কোনো সত্তাই সার্থক হবে না।

প্রদীপ্ত আর্টসের ছাত্র ছিল।

ওর বাবা কোলকাতার নাম-করা ব্যারিস্টার ছিলেন। একবার দাঁড়াতে আশি মোহর নিতেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে আমরা যে বছর বি-কম পাস করি, সে বছরে ও বি-এ পাস করে অক্সফোর্ডে গেছিল ইংরিজী পড়তে—ডক্টরেটও করবে সেখানে। তারপর ও অধ্যাপনা করবে এখানে অথবা বিদেশে।

প্রদীপ্তর মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন খুব। মাকে দেখতে এসেছিল প্রদীপ্ত। কিন্তু এসে দেখতে পায়নি। যেদিন রাতের ফ্লাইটে এল সেদিনই সকালে ওর মা মারা যান। তাই মা'র শ্রাদ্ধ অবধি ও এখানেই থাকবে।

ওর বাড়ি পৌঁছে দেখি ও খাটে শুয়ে বিপ্রদাস পড়ছে শরৎবাবুর।

আমি হেসে বললাম, সে কি রে? অক্সফোর্ডের ইংরিজীনবীশ বিপ্রদাস পড়ছে কি রে?

ও উঠে বসল। বলল, আয় বোস্।

তারপর বলল, যাই-ই বলিস, ইণ্টেলেকচুয়ালদের বুকনি যাই বলুক, শরৎবাবু—শরৎবাবু। বিপ্রদাস—বিপ্রদাস। এখনও পড়তে পড়তে চোখে জল আসে; গলা বুজে আসে। আমার তো পড়তে খুব ভাল লাগে।

আমি বললাম, আমারও লাগে!

প্রদীপ্ত বলল, আসলে ব্যাপারটা কি জানিস, আমরা কেউ স্বীকার করি আর নাই-ই করি, আমরা প্রত্যেক মানুষই, যে যত বড় ইণ্টেলেকচুয়ালই হই না কেন, বেসিক্যালি এমোশনাল। বেসিক্যালি আমরা সেন্টিমেণ্টাল। কেন জানি না, আমার বার বার মনে হয়, যে মানুষের সেন্টিমেণ্ট নেই, এমোশন নেই, সে মনুষ্যেতর জীব। তার সমস্ত অধীত বিদ্যা বৃথা হয়েছে। মানুষ, সে বুদ্ধিক্ষেত্রে যত বড়ই হোক, সে কখনোই হৃদয় ছাড়া বাঁচতে পারে না। বুদ্ধি কখনও হৃদয়কে হারাতে পারে না। হৃদয় চিরদিনই থাকে। বল্? ঠিক না?

আমি বললাম, তুই বোধহয় ঠিকই বলেছিস। তবে আমার মতটা তো মত নয়। কারণ, আমি বেসিক্যালি হৃদয়সর্বস্ব মানুষ, সুবুদ্ধি বল কুবুদ্ধি বল, আমার কোনো বুদ্ধিই নেই। ইণ্টেলেক-চুয়াল বলতে আজকে যাদের ধরা হয়, আমি কখনও তাদের দলে পড়ব না। কারণ বুদ্ধিতে, বিদ্যাবত্তায় আমি তাদের চেয়ে অনেক খাটো। তাই আমার মতটা মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়।

ও বলল, আমার সঙ্গে খাবি? হবিষ্যান্ন?

বললাম, খাব। অধিকন্তু, আমি আজ তোর সঙ্গে থাকব, তোর ঘরে। রাতেও বাড়ি যাব না।

প্রদীপ্তর বুদ্ধিদীপ্ত মুখে একটি উজ্জ্বল হাসি ফুটল। বলল, ব্যাপার কি?

বললাম, অনেক ব্যাপার। চল, আগে খেয়ে নি, পরে বলব। অনেক সময় লাগবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে সামনাসামনি সোফায় বসে অনেক পুরনো দিনের গল্প হলো।

তারপর এক সময় প্রদীপ্ত বলল, এবার বল্ তোর কথা।

আমি বললাম, বলার কিছু নেই, আমি প্রেমে পড়েছি। একজনকে ভালবেসেছি। নিরুপায়ভাবে।

প্রদীপ্ত সোজা হয়ে বসে বলল, এ তো আনন্দের কথা। এখন আমার অশৌচ চলছে, নইলে তোকে নিয়ে ফিরপোতে গিয়ে সেলিব্রেট করতাম।

পরক্ষণেই প্রদীপ্ত বলল, তুই বললি বটে; কিন্তু বাসী খবর।

আমি অবাক হলাম। বললাম, সে কি? তুই জানতেই পারিস না।

প্রদীপ্ত আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল।

বলল, নিশ্চয়ই জানি। আমি তাকে দেখেছি, চিনি এবং খুব ভাল করেই জানি। তোকে আমার খুব হিংসা হয়। প্রেমে যদি কখনও পড়তেই হয়, তাহলে অমন মেয়ের সঙ্গেই পড়তে হয়।

বিশ্বাস কর, দেশে ও বাইরে আমার অনেক বান্ধবী আছে, কিন্তু ওর মধ্যে যা আছে আমি কারু মধ্যে তা দেখিনি। ওর মধ্যে দারুণ একটা আন্তর্জাতিক এলিমেন্ট আছে। ও কখনও ভীষণ বাঙালী, কখনও একেবারে মেমসাহেব। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও যেন কোনো ক্রীশ্চিয়ান সুস্নাতা সন্ন্যাসিনী। ওর মত পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা আমি কোনো মেয়ের মধ্যে দেখিনি।

আমি খুব বিচলিত বোধ করছিলাম।

অধৈর্য গলায় বললাম, তুই কার কথা বলছিস?

প্রদীপ্ত বলল, কেন? যেন জানিস না? রুমার কথা!

আমি চুপ করে গেলাম।

মুখ নিচু করে রইলাম। প্রদীপ্ত বলল, কি? অবাক হলি তো?

আমি বললাম, না। তুই ভুল করেছিস। রুমা নয়। তার নাম বুলবুলি। তুই রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিস? ওর নাম শুনিসনি?

প্রদীপ্ত রূঢ় গলায় বলল, তুই তো জানিস ন্যাকা-সঙ্গীত আমার ভাল লাগে না। গান বলতে একমাত্র আমি ডাবল-ব্যারেলড্ শট-গানকে বুঝি। গান-ফান আমার ভাল লাগে না।

তারপরই হঠাৎ থেমে বলল, কিন্তু দাঁড়া। ব্যাপারটা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, তুই-ই বল, কোন্ ব্যাপার?

প্রদীপ্ত বলল, অভিজিৎ আর রুমা এসেছিল পরশুদিন। অনেকক্ষণ ছিল। তারপর অভিজিৎ বাবার সঙ্গে ওর বাবার কোম্পানীর কি একটা মামলার বিষয়ে পরামর্শ করতে গেল। রুমা আর আমি অনেকক্ষণ গল্প করলাম। গল্প করতে করতে তোর কথা উঠল। ওকে তোর সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত দেখলাম যে, বলার নয়। আমাকে লুকোতে পারবি না রাজা, তুই অস্বীকার কর যে, রুমা তোকে ভীষণ ভালবাসে এ কথা তুই জানিস না?

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রদীপ্ত বলল, কথা বল ? চুপ করে আছিস কেন ?

আমি বললাম, ভালোবাসাটা তো এক তরফা জিনিস নয়।

প্রদীপ্ত বিরক্ত হলো। বলল, আমি বিশ্বাস করি না যে, তোকে আমি অন্তত যতটুকু জানি, রুমাকে তোর ভাল লাগে না। রুমাকে ভালো লাগে না এমন কোনো শিক্ষিত মার্জিত ছেলে থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম, আমি তো বলিনি যে ভালো লাগে না। কিন্তু ভালো-লাগা আর ভালোবাসা তো এক নয়। বুলবুলির প্রতি আমি যে অন্ধ উদ্দাম আকর্ষণ অনুভব করি, রুমার বেলায় সেরকম করিনি কখনও।

প্রদীপ্ত বলল, তোর কি ধারণা ভালোবাসার একমাত্র ফর্ম অন্ধ উদ্দামতা ? ভালোবাসার আরো তো রকম আছে। রুমা কখনও কাউকে এমনভাবে আকর্ষণ করবে না। রুমা যাকে চায় তার অনেক সৌভাগ্য। তুই কি রে ? তুই একটা স্টুপিড। তোর বুলবুলিকে আমি দেখিনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, রুমাকে হারাতে পারে এমন একজনও মেয়ে কোলকাতায় আছে।

আমি বললাম, তা সত্যি। কিন্তু ভালোবাসা তো কোনো বাঁধা পথে চলে না। কি করব বল ? আমি যে ভালোবেসে ফেলেছি।

প্রদীপ্তকে খুব চিন্তিত দেখালো। বলল, তাহলে তো আমি সেদিন খুব অন্যায় করেছি। রুমার কি হবে ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

না। সেদিন রুমা তোর যত না প্রশংসা করছিল, আমি তার চেয়েও বেশী করছিলাম। তোর সম্বন্ধে কত কিছু বললাম ওকে— যা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে কাছ থেকে জানি, ও বন্ধুর বোন হিসেবে তার কিছুই জানে না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর কাছে তোর নিন্দা করাই উচিত ছিল আমার। তাহলে যদি মেয়েটার

মন একটু শান্ত হতো। তোর থেকে মন সরে আসত। এতে তো জ্বালা আরও বাড়বে বেচারীর। ঈস্—স্। ছাখ তো! কি অন্যায় করলাম!

আমার খুব খারাপ লাগে রে প্রদীপ্ত। যখনই রুমার কথা ভাবি, খুবই খাবাপ লাগে। কিন্তু আমি বড় স্বার্থপর হয়ে গেছি এখন। বুলবুলির পাশে রুমাকে দাঁড় করালে আমার মনে রুমা বার বার হেরে যায়। আমি তোকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না প্রদীপ্ত, কেন এমন হয়। কিন্তু হয়। আমাকে তুই ক্ষমা করে দে।

আমার ক্ষমা করার কথা কিসে আসছে?

কিন্তু রুমা কি তোকে ক্ষমা করবে? মেয়েরা ছেলেদের মত উদার হয় না। মেয়েরা এ সব ব্যাপারে ক্ষমা কাকে বলে জানে না।

তারপর ও বলল, এটা আমার বুদ্ধির বাইরে। আমার মনে হয়, কাউকে ভালো-লাগা কি খারাপ লাগার ব্যাপারে প্রত্যেকের সাব্‌কনসাস্ স্টেটে সেক্স-অ্যাপীল দারুণভাবে প্লে করে। বুলবুলির প্রতি তোর যে ভালো-লাগা, তার পিছনে তোর অজানিতে এমন কিছু একটা তোর মাথার মধ্যে কাজ করে যে, তুই নিজেই তার খোঁজ রাখিস না।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, প্লিজ প্রদীপ্ত, এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর। আমি তাকে ভালোবাসি, জাস্ট্ ভালোবাসি। তুই এমন করে ভালোবাসার শবব্যবচ্ছেদ করিস না। আমার খুব খারাপ লাগছে।

তারপর আবার বললাম, জানি না, রুমা ওর চারপাশে এমন এমন সব ছেলে থাকতে আমার মত জ্যাক্ অব অল ট্রেডস্-এর মধ্যে কি এমন দেখতে পেল! আমার প্রতি রুমার এই আশ্চর্য আকর্ষণও কোনো নিয়মের মধ্যে পড়ে না। এও এক ব্যাখ্যাহীন ব্যতিক্রম।

প্রদীপ্ত বলল, ঠিক আছে। অন্য কথা বল।

কিন্তু এর পরে অন্য কথা আর জমল না।

প্রদীপ্তর বইয়ের আলমারী থেকে টমাস মানের একটা মোটা বই বের করলাম। ম্যাজিক মাউন্‌টেন্‌। বইটার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু বইটা পড়া হয়নি।

আমি এক জায়গায় বসে বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলাম, আর প্রদীপ্ত আবার বিপ্রদাস পড়তে লাগল।

আমাদের দুই বন্ধুর সমস্ত ঘনিষ্ঠ নৈকট্য রুমা যেন তার স্নিগ্ধ শীতল অনুপস্থিত উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন করে দিল—শীতলতার সমুদ্রে দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, পাশাপাশি; তবু বহু দূরে, আমরা ভেসে রইলাম।

॥ ৯ ॥

অচেনা পরিবেশে ঘুম ভাঙলে প্রথমে কিছুক্ষণ বোকা বোকা লাগে।

নিজের ঘরের সিলিং, দেওয়ালের ছবি, জানালার পাশের বোগেনভেলিয়া লতা কিছুই না দেখতে পেয়ে কয়েক মুহূর্ত মাথাটা শূন্য হয়ে রইল।

পাশ ফিরতেই দেখলাম, আমার পাশে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে প্রদীপ্ত শুয়ে আছে অশৌচের পোশাকে। ওর মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হবিষ্যান্ন করায় সৌম্য চেহারার এক বিশেষ দীপ্তি লেগেছে।

প্রদীপ্তর সুন্দর মুখে রোদ এসে পড়েছে। প্রদীপ্ত অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

মাথার পাশে মাটিতে টেবল্ ল্যাম্পটা রাখা আছে। নিবানো। তার পাশে বিপ্রদাস।

সবে ঘুম ভেঙেছে, এমন সময় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা খুলে দেখলাম, প্রদীপ্তর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

উনি বললেন, এ কি রাজা? তুমি বাড়িতে বলে আসনি যে, এখানে থাকবে? তোমার বাবা কাল তোমরা শুয়ে পড়ার পর ফোন করেছিলেন। উনি গাড়ি পাঠিয়েছেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

বলেই, মেসোমশায় চলে গেলেন।

প্রদীপ্ত ঘুম ভেঙে বলল, কি রে?

আমি বললাম, এখন যেতে হবে। শিয়রে শমন। ফিরে এসে হয়তো তোর ঘরেই থাকতে হবে। থাকতে দিবি তো?

ও বলল, ইয়ার্কি করিস না। কি বলেন আগে ভাখ। ফোন করিস। ভুলিস না।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, সাদা ওপেল ক্যাপিটান গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে।

ড্রাইভার একটা চিঠি দিল হাতে। দেখলাম, বাবার লেখা।

ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে বাবা লিখেছেন, 'কাম ইমিডিয়েটলি। সী মি এজ সুন এজ উ কাম'।

বাড়ি পৌঁছে, সিঁড়ি দিয়ে বাবার ঘরের দিকে উঠতে উঠতে অনেক কথা মনে হচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল, এই শেষবারের মত এ বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠা। এ বাড়িতে আমার কৈশোর শেষ হয়েছে, যৌবন আরম্ভ হয়েছে।

সিঁড়িতে গোপাল ঘোষের দু'টি স্কেচের রিপ্রোডাকসান—। আমিই অনেকদিন আগে কিনে এনে লাগিয়েছিলাম। কত স্মৃতি, কত পুরোনো টুকরো টুকরো কথা—সব হারিয়ে যাবে। মুছে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার।

বাবা তাঁর ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

আজ রবিবার। বাবা বাগানে যাবেন। পায়ে লাল-রঙা তালতলার চটি। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন।

আমি পিছন থেকে ডাকলাম, বাবা!

বাবা হঠাৎ এক মোচড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

আমার মনে হলো, বাবা তাঁর পয়েন্ট থ্রি টু রিভলবার দিয়ে আমার পেটে গুলি করলেন।

কিন্তু কোনো শব্দ হলো না।

তারপর দেখলাম, বাবার মুখ প্রসন্ন এবং মুখে এক বিচিত্র হাসি।

হাতীর দলের সর্দার নতুন ছোকরা হাতীর বাড়াবাড়ি দেখে যেমন চোখ করে তার দিকে তাকায়, বাবা তেমন চোখে আমার দিকে তাকালেন।

পরক্ষণেই বাবা হেসে ফেললেন। বললেন, পারমিশান গ্রান্টেড। এখন সোজা নিজের ঘরে চলে গিয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্সীর বই খুলে সামনে ঘড়ি নিয়ে বসে পড়ো। তিন ঘণ্টায় ছ'টা ব্যালান্স সীট মেলাতে হবে।

তুমি যাকে স্ত্রী হিসেবে চাও, তাকে পাবে। এখন প্রমাণ করো যে, তোমার অন্য ব্যাপারেও জেদ আছে। যা চাও তা করতে পারা তো সোজা। যা চাও না, সেটা করাই বাহাদুরী। যাও।

আমার গলায় থুথু আটকে গেছিল।

কি করব, কি আমার করা উচিত, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসছিলাম, অথবা উড়ে আসছিলাম।

মা ডাকলেন পিছন থেকে।

মা একটা সাদা খোলের ফলসা রঙা চওড়া পাড়ের তাঁতের শাড়ি পরেছিলেন। চা-টা খেয়ে পান খেয়েছিলেন। মুখ দিয়ে সুগন্ধি জরদার খুশবু বেরোচ্ছিল। গলায় একটা মোটা বিছে-হার।

মা পান-মুখে মুখ উঁচু করে জবজবে গলায় বললেন, দাঁড়া। কথা আছে।

মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দাঁড়ালাম।

মা খাবার-ঘরে ডাকলেন। তারপর বললেন, চা খাবি না! বলে আমার সামনের চেয়ারে বসলেন, চা দিলেন।

তারপর বললেন, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

তোর বাবার জন্যে ভেবে মরলাম, তুই এরকম করছিস জানলে তোর বাবার না জানি স্ট্রোকই হবে ভাবলাম ; আর সেই তিনি কিনা আমাকে গালাগালি করে একশেষ করলেন!

পুরুষ জাতটাই বড় অকৃতজ্ঞ।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, কি হলো ?

মা পানের ঢোক গিলে, অভিমানী গলায় বললেন, তোর বাবা আমাকে খুব বকলেন ; বললেন যে, আমার জন্যেই নাকি তুই পরীক্ষা পাস করতে পারিসনি। বললেন, ছেলে কি আমার ফেল করার ছেলে ? তুমিই তো গোড়া থেকে আমাকে কিছু না-জানিয়ে এমন করেছ। ও যদি কাউকে তেমন করে ভালোই বেসে ফেলে, আর একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, তাহলে কি পড়াশুনা করতে পারে ? তুমি খুব অন্যায় করেছ আমাকে না জানিয়ে।

বলেই মা চুপ করে গেলেন।

মা'র চোখের কোণায় দু' ফোঁটা জল চিকচিক করতে লাগল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরলাম।

মা তাতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ; বললেন, আমিই তোর শত্রু, আর সকলেই তোর মিত্র।

আমি বললাম, কি কবছ মা, ওরকম কোরো না !

মা আমাকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে সামলে নিলেন নিজেকে।

একটু পরে মা বললেন, এবার পাস করতে পারবি তো ?

আমি হাসছিলাম।

ছোটবেলা থেকে, ঠিক মনে পড়ে না, আজকের দিনের মত এত খুশী আমি এর আগে কখনও হয়েছিলাম কিনা !

আমি বললাম, নিশ্চয়ই ! তুমি দেখো, পাস করি কি না !

মা বললেন, তোর জীবনটা তো তোরই। তুই যাকে নিয়ে সুখী হবি, তাকেই আমি খুশী মনে গ্রহণ করব। কিন্তু সুখী কি তুই হবি ?

আমি বললাম, এ কথা কেন বলছ মা ?

বলছি এই জন্যে যে, তোকে আমি যত ভালো জানি, আর কেউই তত ভালো জানে না। ছোটবেলা থেকেই তোর স্বভাবটা

অদ্ভুত। যা করবি, যার জন্যে তুই বায়না ধরবি, তা না পেলে তুই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবি; আর যেই তা পাওয়া হয়ে যাবে, অমনি দু'দিনে তা তোর কাছে পুরোনো হয়ে যাবে।

তাকে অবহেলায় ধুলোয় ফেলে আবার তুই নতুন কোনো বায়না ধরবি।

জানিস, আমার কেবলি মনে হয়, তোর মনটা ঘাসফড়িং-এর মত। কোথাও দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না।

বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়। সমস্ত জীবনের ব্যাপার। অন্য একটা মেয়ের সমস্ত ভালমন্দ তোর উপরে নির্ভর করবে। তুই যেরকম খেয়ালী, তোর যেমন অস্থিরমতি, তোর জেনেশুনে কোনো মেয়েকে ঠকানো উচিত নয়।

তুই যদি আমাকে জিগ্‌গেস করিস তো আমি বলব, তোর বিয়েই করা উচিত নয়। কোনো মেয়েই তোকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না। তোর এমনই স্বভাব। তুই জেদী, রাগী, ভীষণ খেয়ালী, তোর কাছে তোর গায়িকাও দু'দিনে পুরোনো হয়ে যাবে। তখন তুই অন্য কারো দিকে হাত বাড়াবি, তার প্রতি অবিচার করে।

আমি চুপ করে থাকলাম।

আমার সম্বন্ধে মা'র কোনো অভিযোগই মিথ্যা নয়।

এবং মা এখন যা বলছেন, তা আমার ভালোর জন্যে যত না, হয়তো বুলবুলির ভালোর জন্যে তার চেয়েও বেশী।

কিন্তু আমি কি করব? আজকে আমার জীবনে বুলবুলির চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছুই নেই, তার চেয়ে বেশী প্রার্থনা আমি কিছুর জন্যে, কারুর জন্যেই করি না। তার জন্যে এ মুহূর্তে আমার যা আছে, আমি সব দিতে পারি।

এই সত্য ক্ষণিক কি না জানি না, ক্ষণিক হলেও, এই-ই চরম ও পরম সত্য। ভবিষ্যতে যদি অন্য কেউ আমাকে আবার এমনই কোনো পাগল-করা অনুভূতিতে ভরিয়ে দেয়, আমার

সমস্ত সত্তা এমনি করেই আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আমি কি করব, তা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়। জীবনে কোনো বাঁধা-ধরা শর্ত মেনে, কোনো বাহিত পথে আমি কখনও চলতে পারব না। আমার মন যা বলবে, হৃদয় যা চাইবে, আমি সেইমত আগুনের দিকে ধাবিত পতঙ্গের মতো এগিয়ে যাব।

আমি জানি যে, এইভাবে বাঁচা কোনো বুদ্ধিমান দায়িত্বশীল মানুষের বাঁচা নয়। প্রত্যেকের জীবন মানেই কতগুলো শর্ত। সম্পর্ক মানেই অলিখিত চুক্তি। বুদ্ধিমান ও কন্‌সিস্‌ট্যান্ট মানুষ মাত্রই এই শর্ত, এই চুক্তি মেনে চলেন। আমি বুদ্ধিমানও নই, কন্‌সিস্‌ট্যান্টও নই। আমি একজন হৃদয়বান, ভাবাবেগসম্পন্ন মূর্খ মানুষ। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার আনন্দ, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, বুলবুলির অদেখা নরম কবোষ্ণ বুক মুঠিভরে ধরার তীব্র আনন্দের মতো। এতে কোনো ফাঁকি নেই।

বুদ্ধিমান হবার জন্যে আমি কখনও ইনসিন্‌সিয়র হতে চাই না। যদি দুঃখ পাই কখনও, সে দুঃখকে সমস্ত আন্তরিকতায় বুকে আঁকড়ে ধরে দুঃখের স্বরূপটাকে বোঝার চেষ্টা করব। যদি আনন্দ পাই তো সেই আনন্দের তীব্র অঙ্গীকারে নিজেকে একটুও বাকি না রেখে ভাসিয়ে দেবো। আমার জীবনকে আমি কখনও শর্তাধীন করে রাখব না কোনো কিছুর কাছেই, কারো কাছেই। এমন কি বুলবুলির কাছেও না। সামাজিক সমস্ত শর্তের জালের মধ্যে বাস করেও আমি এক শর্তহীন, স্বাধীন, অসামাজিক জীবনযাপন করব।

আমার স্বাধীনতা—বাঁচার স্বাধীনতা, ভালো-লাগা আর ভালোবাসার স্বাধীনতা আমি কারো কাছে কোনো উচ্চতম মূল্যেও বিকোতে রাজী নই। কিছুতেই—কিছুতেই রাজী নই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি।

মা এত কথা বুঝবেন না। মা একজন পতি-পরম-গুরুতে বিশ্বাসী সামাজিক অনুশাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, লক্ষ লক্ষ বাঙালী

মায়ের একজন। তাঁর কালাপাহাড় ছেলের এমন সব বিপ্লবী ধারণার কথা শুনলে মা'র অসুখই শুধু বাড়বে।

তাই-ই চুপ করে থাকলাম অনেকক্ষণ।

তারপর বললাম, মা, ভবিষ্যতের কথা জানি না। ভবিষ্যতের কথা কেই বা জানে? আমি তোমাকে আজকের কথা বলতে পারি। বুলবুলিকে আমি খুব ভালোবাসি মা। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এত ভালোবাসিনি। এর চেয়ে বেশী আমি কিছু জানি না।

মা আরও একটা পান মুখে দিলেন রূপোর বাটা থেকে।

বললেন, কি জানি! তোর জন্যে এখন যত না চিন্তা হয়, সেই মেয়েটার জন্যে আরও বেশী চিন্তা হয়। সে জানে না, কাকে সে বিয়ে করছে। এমন ছেলেকে বেঁধে রাখা পৃথিবীর কোনো মেয়েরই পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়েটার কপালে অশেষ দুঃখ লেখা আছে।

সেদিন সত্যিই খাবার-ঘর থেকে বেরিয়ে, নিজের ঘরে গিয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্সীর বই খুলে বসলাম। সেদিন ব্যালান্স সীটগুলো পটাপট মিলে যেতে লাগল। অ্যাকাউন্ট্যান্সী যে একটা এত সহজ ও ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, তা আমি আগে কখনও জেনেছি বলে মনে হলো না। আমার মন বলতে লাগল, পরীক্ষাটা নভেম্বরে না হয়ে আরও তাড়াতাড়ি হলে ভাল হতো। কারণ আমার কোনো সন্দেহ নেই মনে যে, এবার বসলেই আমি পাস করব।

আমার মনটা কিছুতেই এতদিন অ্যাকাউন্ট্যান্সীর মধ্যে ঢুকতে চাইত না। মনটা আগ্রহী হলে, কিছু জানব বা করব বলে পণ করলে, তা জানতে পারব না বা করতে পারব না, এমন কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার।

আমার মন এখন আমার সম্পূর্ণ অধীন। মন এখন বাহির পথে বিবাগী হিয়ার মতো কোনো মরীচিকার পিছনে ধাবমান নয়। মন এখন কেন্দ্রীভূত, কেন্দ্রবিন্দুতে সমাধিস্থ; এ মনের

অন্বিষ্ট কিছু থাকলে তা নিশ্চিতভাবে বিন্যস্ত হয়ে আমার কবলিত হবেই। কোনো বাধাই এখন আর বাধা নয়।

সেদিনই বিকেলে অর্ঘ্য ফোন করল।

বলল, তুমি বলেছিলে জর্জদা'র কাছে গান শিখতে যাবে—আজ তোমাকে নিয়ে যাব। আমি বলে রেখেছি।

আমি বললাম, চলে এসো। আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

ইতিমধ্যে আমার প্রিয় গানের স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিন হলো। কারণ, বাবা বলেছিলেন বলেই শুধু নয়, সেখানের কড়া নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আমার পরীক্ষার প্রস্তুতির নিয়মানুবর্তিতার ঘন ঘন সংঘাত হচ্ছিল বলে।

জর্জদা'র বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই। রবিবার রবিবার সকালে সকালে ক্লাশ। তাই ঢিলেঢালাভাবে সপ্তাহে একদিন গানের রেওয়াজ থাকবে। এই ভেবেই অর্ঘ্যকে বলেছিলাম।

জর্জদা'র সবচেয়ে নিয়মিত ও প্রণত ছাত্র ছিল অর্ঘ্য। ও গত কয়েক বছরে একদিনও ক্লাশ মিস্ করেনি।

জর্জদা ওকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন।

অর্ঘ্যর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় যখন ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের পাশে একটি দোতলা বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, তখন জানতাম না যে, এমন একজন মেজাজী রসিক লোকের সঙ্গে আলাপ হবে।

ছোট ঘর। চার ধারে স্তূপীকৃত বইপত্র, চাইনীজ ছবি; নানা কিউরিও মাটিতে অবহেলায় ফেলে রাখা। মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা। একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে আর খয়েরী লুঙি পরে সামনে হারমোনিয়াম নিয়ে জর্জদা বসে আছেন। মুখে পান, সামনে পানের বটুয়া, পাশে গলা স্প্রে করার যন্ত্র।

একঘর ছেলেমেয়ে বসে আছেন।

আমি দরজায় দাঁড়িয়ে জর্জদাকে নমস্কার করলাম। অর্ঘ্য আলাপ করিয়ে দিল।

জর্জদা হাসলেন, চোখ তুলে এক অদ্ভুত কৌতুকময় তাচ্ছিল্যের

চোখে যেন তাকালেন আমার দিকে। বললেন, চেহারাখান তো লম্বা-চওড়া দেখি, তা গলাখান্ কেমন? কোথায় গান শেখা হইছে?

আমি নাম বললাম। জর্জদা বললেন, সব্বনাশ! তা অত বড় স্কুলের পর আমার কাছে ক্যান?

আমি বললাম, কারণটা ব্যক্তিগত। তাছাড়া আপনি বাড়ির কাছে থাকেন।

অ। বুঝ্ছি। বললেন জর্জদা।

সেই প্রথম আলাপ।

সবে গান আরম্ভ হবে। হারমোনিয়াম কোলে তুলে নিয়ে জর্জদা সুর ভাঁজছেন, এমন সময় এক মহিলা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলেন।

জর্জদা তাঁকে দেখে খুব খুশী হলেন দেখলাম।

বললেন, আসো আসো। কি? পথ ভুইল্যা?

মহিলা বললেন, না। মোটেই না।

জর্জদা বললেন, বলো, কি খাবা?

রসগোল্লা। মহিলা বললেন।

জর্জদা ডাকলেন, হতকুৎসিত!

'যাই' বলে উত্তর দিয়ে একটি নিরীহ চেহারার লোক এসে বলল, আজ্ঞে বাবু!

জর্জদা বললেন, পাঁচ টাকার রসগোল্লা নিয়ে এস।

জর্জদা'র মত গুরুচণ্ডালী ভাষায় কথা বলতে আমি কাউকে দেখিনি।

এই বাঙাল ভাষায় বলছেন, পরক্ষণেই কলকাতার ভাষায় বলছেন। লোককে সর্বক্ষণ এমন বুদ্ধি ও রসবোধে চমকে রাখতে খুব কম লোককে দেখেছি।

জর্জদা আমার চোখে তাকালেন। আমি নিরীহ বাহনের সঙ্গে হতকুৎসিত নামটার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না দেখে, নিজেই হাসতে হাসতে বললেন, ওর আসল নামটা ভাল। তবে

আমার মতো কুদর্শন লোকের যে চাকর, তাকে হতকুৎসিত না হলে মানায় না। তাই ওকে হতকুৎসিত বলে ডাকি।

পরক্ষণেই, আমার কাছে কিছু শোনার প্রত্যাশা না করেই, আগন্তুক ভদ্রমহিলাকে একটা নামে ডেকে বললেন, ব্যাপারটা ভালই। বিয়া করণের সময় অমুক ভট্টাচার্যি আর রসগোল্লা খাওনের বেলায় জর্জদা!

আমরা সকলেই হেসে উঠেই থেমে গেলাম আচমকা।

বুঝলাম, পটভূমিকা না জেনে হাসাটা বোকামি। এই সহজ সরল রসিকতা হয়তো নিছক রসিকতা নয়।

তারপর গান আরম্ভ হলো—

"কেন সারাদিন ধীরে ধীরে,
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে॥"

চোখ বন্ধ করে জর্জদা গান গাইতে লাগলেন।

আমার খুব ভাল লাগতে লাগল। গলা কি দরাজ, সুরে ও দরদে ভরপুর! তখন জর্জদা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এতরকম একস্‌পেরিমেন্টে নামেননি। জর্জদা'র গান শুনলেই মনে হতো অন্য কোনো এক উচ্চতায় পৌঁছে গেলাম মনে মনে।

গানের একটা জায়গায় এসে বললেন, স্বরলিপি থাউক, যেমন কইর‍্যা গাইতাছি, তেমন কইর‍্যা গাও।

সামান্য একটা পর্দার সামান্য এদিক-ওদিক। শুদ্ধর জায়গায় কোমল লাগাতেই গানটার ডাইমেন্‌শান বদলে গেল। মনে হলো, ইস্‌, স্বরলিপিতে এমন কেন নেই?

জর্জদা হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে অর্ঘ্যকে বললেন, কোনো ফাংসনে আবার এই সুরে গেয়ে বসবে না। লোকে কইবে, জর্জ বিশ্বাস স্বরলিপি মানে না। তবে আমার নির্ঘাত জেল।

আমরাও হাসতে লাগলাম।

জর্জদাও হাসতে লাগলেন।...

মঞ্জুশ্রী চাকী একটু পরে চলে গেলেন। জর্জদা'র গানের সঙ্গে

ওঁর কোনো নাচের প্রোগ্রাম ছিল। পরের সপ্তাহে।

শ্রীলা সেনের চেহারা এবং গলা, দুইয়েরই আমি ভীষণ অ্যাডমায়ারার ছিলাম। উনি আমার কলেজের এক সহপাঠীর দিদি হন। জানতাম, কিন্তু আলাপ ছিল না। তাই সামনে বসে তাঁর গান শোনা ও তাঁকে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগল।

সেদিন ঐ গান শোনার পরই ছুটি হলো আমাদের।

বাইরে এসে অর্ঘ্য বলল, কেমন লাগল রাজা?

আমার সত্যিই ভাল লেগেছিল। ঐ ঘরোয়া পরিবেশ, ঐ শিল্পীসুলভ রসিক মানুষ, তাঁর ঢিলেঢালা বেশবাসের মতো ঢিলেঢালা অনিয়মানুবর্তী জীবন।

বাড়ি এসেই চানটান করে মেঝের গালচেয় পা ছড়িয়ে বসে আবার আমার বুলবুলির রেকর্ড দুটো শুনলাম। না, আমার কোনো ভুল হয়নি। বুলবুলি আমার জাত-গাইয়ে।

একদিন যখন তার মৌটুসী পাখির মতো চিকন গলা সুরে ভরে গিয়ে ভরা কলসীর মতো গভীর হবে, সেদিন সে দশজনের মধ্যে একজন হবেই। সে যে বড় গাইয়ে হবেই, এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর, অনেক অনেক রাতের পর, দারুণ আবেশে ঘুমোলাম। আরামে ঘুমোলাম।

সে-রাতে এক দারুণ আশ্লেষভরা স্বপ্ন দেখলাম। সে স্বপ্ন আজও আমার মনে আছে। সে স্বপ্ন কাউকে দেখানো যায়নি; যাবে না কখনও। আমার প্রেমিক ভাবুক ছেলেমানুষী মনে সে স্বপ্ন এক সোনালী নরম উড়ন্ত কাঠবিড়ালীর মতো উড়ে বেড়িয়েছে। যত দিন বাঁচব, উড়ে বেড়াবে।

সে স্বপ্ন যদি কোনোদিন সত্যিও হয়, সেই সত্যতা হয়তো কখনও কোনোক্রমেই সেই স্বপ্নের আবেশের সমকক্ষ হবে না।

॥ ১০ ॥

একটা কঠিন গান আগের দিন তোলানো হয়েছিল। সে গানটা কাল জর্জদা কেমন তোলা হয়েছে, দেখছিলেন।

আমার পাশে যে ছেলেটি বসেছিল, তাকে আমি চিনতাম, নামও জানতাম তার।

তার পালা যখন এল তখন আভোগে এসে সে কোমল রেখাবের জায়গায় শুদ্ধ রেখাব লাগাল। অথচ পুরো গানের মেজাজটা ওই কোমল পর্দার উপর দাঁড়িয়েছিল।

জর্জদা পান খেতে খেতে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি পাশে-বসা ছেলেটির কানের পাশে গুনগুনিয়ে বলতে গেলাম যে, ভুলটা কোথায়।

জর্জদা'র বোধহয় মেজাজ ভাল ছিল না।

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঠোঁটকাটা ভাষায় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ল্যাংড়া অন্ধরে পথ দেখায়।

একটা হাসির দমক ক্লাশসুদ্ধ ছেলেমেয়ের পেট থেকে গলা অবধি এসে আবার পেটে নেমে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু হাসিটা সকলের চোখে ছড়িয়ে রইল। ভীষণ লজ্জা পেলাম।

এ জন্যেই বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন, কখনও কারো উপকার করতে নেই।

আমার মনটা এমনিতেই খুব খারাপ ছিল। তার উপর এই হেনস্থাতে মনটা তেতো হয়ে গেল।···

সেই আলটিমেটামের পর ক'দিন পেরিয়ে গেছে। আজ পঞ্চম দিন।

কিন্তু আজ অবধি বুলবুলির কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি

চিঠির।

আমার চিঠিতে আমার অফিসের ফোন নম্বরও দেওয়া ছিল। চিঠি লিখতে সংকোচ হয় তো একটা ফোনও করতে পারত। কিন্তু তাও করেনি।

পাঁচ দিন অবধি ভাবছিলাম, চিঠিটা আসতে সময় লাগছে। পাঁচ দিন অবধি রাগটা পোষ্ট অফিসের উপরই ছিল।

পাঁচ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর বুলবুলির উপর রাগ হতে আরম্ভ হলো।

অফিসের বেয়ারাদের ঘন ঘন ডাক দেখতে নীচে পাঠাতে লাগলাম।

তারা বারংবার বলতে লাগল, এ সময় কোনো চিঠি আসে না। চিঠি একবার সকালে, একবার দুপুরে ও শেষ সন্ধ্যেবেলায় আসে। এখন দেখে কি হবে?

আমি বললাম, বলছি, যাও না। আমার জরুরী খবর আসবে একটা বোম্বে থেকে।

বেচারারা উপর-নীচ করে, ডাকবাক্স খুলে খুলে হয়রান হলো; কিন্তু চিঠি এল না।

সাত দিনের দিনও যখন কোনো চিঠি এল না, তখন হঠাৎ এক সময় বিকেলের দিকে অফিসে বসে কাজ করতে করতে বুলবুলির উপর দমবন্ধ রাগটা হঠাৎ উবে গিয়ে একটা ভীষণ স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ভীতি আমাকে পেয়ে বসল। একটা অপমানবোধ আমাকে দারুণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার পেটের মধ্যে সেই ভয়টা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে লাগল।

জীবনে আমি এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি।

নিজেকে নিজের লাথি মারতে ইচ্ছে করছিল, নিজের গায়ে নিজে থুথু দিতে ইচ্ছে করছিল।

যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে, এমনভাবে একটা বাজে সস্তা মেয়ে, একটা নির্গুণ গলাসর্বস্ব সাধারণ মেয়ে আমাকে অপমান

করতে পারে, আমাকে অপমান এবং প্রত্যাখ্যান করার সাহস সে রাখে, তা হলে কখনও কি আমি যেচে নিজে থেকে ছোট হয়ে তাকে ভালোবাসা জানাতে যাই ?

নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে বললাম, যা হয়েছে, তা ভালই হয়েছে। এ শিক্ষার আমার দরকার ছিল। আমি নিজেকে কী-ই না একটা ভাবতাম ! নিজে নিজে মনে মনে নিজের সম্বন্ধে অহেতুক ফেঁপে উঠেছিলাম। কোন্ সর্বনাশে ভর করে আমি তার পেছনে পথের কুকুরের মতো ধেয়ে গিয়ে তার হাতে আমার মৃত্যু-পরোয়ানা ধরিয়ে দিয়ে এলাম সেদিন ? কার দুর্বুদ্ধিতে ?

সে কথাই ভাবছিলাম।

ছিঃ ছিঃ, এদিকে বাবা ও মা অনেককে বলে ফেলেছেন যে, আমি নিজের ইচ্ছামত মেয়ে পছন্দ করেছি। বলেছেন তার নাম-ধাম, তার সমস্ত গুণাবলী। আমার কানে এ-ও এসেছে যে, মা বলেছেন —ছেলে আমার সে মেয়ের প্রেমে পাগল।

তখন ব্যাপারটা তো শুধু আমার নিজের সম্মানেই (যদি এ হতভাগার সম্মান বলে কোনো বস্তু এখনও থেকে থাকে) সীমিত নয়, এখন তো আমার মা-বাবার সম্মানও এর মধ্যে জড়িয়ে গেছে।

রাগে আমার হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না।

এ-ই প্রথম আমি কাউকে এমন হাঁটু-গেড়ে-বসে ভালোবাসা জানালাম, এত নিচু হলাম, নিচু করলাম নিজের অস্তিত্বকে—আর এই-ই কিনা শেষ !

বুলবুলি যদি সত্যিই আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে কি জীবনে অন্য কোনো মেয়েকে আমি কখনও বলতে পারব যে, আমি তোমাকে চাই।

আমার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। আমার নিজের সম্বন্ধে সব বিশ্বাস, সব গর্ব চুরমার হয়ে যাবে। অথচ এখন কিছুই করার

নেই। কিছুমাত্র বাকী নেই আর। আমার হাতের তাস চালা হয়ে গেছে। এখন হার-জিত অন্যের হাতের তাসে। এখন একটি অন্তঃসারশূন্য ন্যাকা-সঙ্গীত গাওয়া মেয়ের করুণার উপর নির্ভর করে হাঁ করে চাতক পাখির মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হবে।

সেদিন অফিস-ফেরতা একবার ওদের বাড়ির সামনে একটা চক্করও মেরে গেলাম। ওকে দেখা গেল না। বাড়ির ভিতর থেকে অনেক মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

এত হাসি কিসের? এত হাসি আসে কোথা থেকে? ভেবেই পেলাম না।

পরক্ষণেই আমার বুক ছমছম করে উঠল। এত বড় চওড়া রাস্তায় অনেক পথচারীর সঙ্গে পথ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার মনে হলো, ওরা বাড়িসুদ্ধ লোক আমার চিঠি নিয়ে হাসাহাসি করছে না তো?

বুলবুলি কি আমার চিঠি সকলকে দেখিয়েছে?

জানতে ইচ্ছে হলো, তা হলে মানুষের চোখের ভাষা কি কোনো ভাষাই নয়? মানুষ মুখে যা বলে, অ্যামপ্লিফায়ারে যা চেঁচিয়ে জানায়, সেটাই একমাত্র কম্যুনিকেশান, নীরব চোখে কি কেউ কাউকে কিছু বলতে পারে না? একে অন্যকে বুঝতে পারে না? আমি এতদিন যা বুঝলাম, যা বিশ্বাস করলাম, সবই কি ভুল?

আমার এখন কি কথা উচিত ভেবে পেলাম না।

নিশ্চয়ই তাদের বাড়িতে গিয়ে, আমার ভালোবাসার বদলে সে আমাকে কেন ভালোবাসবে না—এই নিয়ে তার গুরুজনদের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। তার সঙ্গে তো নয়ই।

ভাবলাম, সে যদি আমাকে সত্যিই প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমার চোখ এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবো। যাতে তাকে আর কখনও দেখতে না হয়।

পরক্ষণেই ভাবলাম, না। তা কেন? ও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে রুমার কাছে দৌড়ে যাব। পরীক্ষায় অল-ইণ্ডিয়া রেকর্ড করব। তারপর একদিন নতুন সাদা ছিপছিপে স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড গাড়িতে রুমাকে পাশে বসিয়ে বুলবুলি নামক রুমার এক বান্ধবীর বাড়িতে আমাদের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসব—রুমার সঙ্গে আমার বিয়ের। কোনো দিক দিয়ে রুমার সে পায়ের নখেরও যুগ্যি নয়।

হাঃ হাঃ! প্রতিশোধ আমিও নিতে জানি। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

যে-মেয়ে শ্যামলের মত ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চায়, বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায়, নিজেকে ওজন করিয়ে বেড়ায় প্রস্‌পেক্‌টিভ শ্বশুর-শাশুড়ীর অশিক্ষিত বুদ্ধির তুলাদণ্ডে, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ঘৃণা ছাড়া, অনুকম্পা ছাড়া তাকে আমার দেওয়ার কিছুই নেই।

বুলবুলি না হাঁড়িচাঁচা!

অফিস থেকে ফিরে সেদিন চান-টান করে বুলবুলির রেকর্ডটা কাগজে মুড়ে নিয়ে প্রদীপ্তদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

প্রদীপ্ত ওর বাবার লাইব্রেরীর পাশের বড় ড্রয়িং রুমে বসেছিল ওর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে। চার-পাঁচদিন পর ওর মায়ের কাজ। বাড়িতে অনেক লোকজন। প্রদীপ্ত সকলের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছিল।

আমাকে দেখেই বলল, কি খবর রে? আয়, চল্ আমার ঘরে যাই।

প্রদীপ্ত নিজের ঘরে এসে সোফায় বসল। তারপর ধীরেসুস্থে বলল, বল্, তোর কনকোয়েস্টের খবর বল্।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুই জানিস?

ও অবাক হয়ে বলল, কি?

না। জানিস কি না বল্ না?

কি জানি সেটা আগে বল্‌?

বললাম, তুই জানিস যে, আমি এক ঠগীর পাল্লায় পড়েছি। বুলবুলি একটা জোচ্চোর, একটা ফোর-টোয়েন্টি।

প্রদীপ্ত গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, তোর দেখছি, ভীষণ অবনতি ঘটেছে। একটি অপরিচিতা মেয়ে সম্বন্ধে, যার তোর স্ত্রী হবার সমস্ত সম্ভাবনা আছে, তার সম্বন্ধে তুই এরকম ভাষা ব্যবহার করতে পারিস কি করে আমি ভাবতে পারি না!

আমি নিজেও লজ্জা পেয়েছিলাম। আমার মুখ থেকে অনবধানে এমন ভাষা বুলবুলি সম্বন্ধে কি করে বেরোল তা আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না।

আমি চুপ করে মুখ নিচু করে রইলাম।

প্রদীপ্ত বলল, তোর হাতে কি?

আমি বললাম, ওর রেকর্ড।

প্রদীপ্ত উৎসাহের গলায় বলল, দে, আমাকে দে। যদিও আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসি না, কিন্তু তুই যাকে ভালোবাসিস তার গান শুনতে নিশ্চয়ই আগ্রহ হয়।

বলেই, প্রদীপ্ত হাত বাড়াল আমার দিকে। বলল, দে রাজা, আমায় দে।

আমি তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম দেখে, প্রদীপ্ত বলল, আচ্ছা তুই একটু বোস। আমি পিসীমার কাছ থেকে গ্রামোফোনটা চেয়ে আনি।

আমি তবুও কথা বললাম না।

প্রদীপ্ত ঘর থেকে চলে যেতেই আমি রেকর্ডটা আছড়ে ফেললাম মেঝেতে। সেভেন্টি-এইটের রেকর্ড। শব্দ করে রেকর্ডটা ভেঙে গেল। আমি আমার জুতোসুদ্ধ পা দিয়ে রেকর্ডটা গুঁড়িয়ে দিতে লাগলাম। যতক্ষণ না রেকর্ডটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ততক্ষণ লাথি মারতে লাগলাম।

আমার সারা শরীরে একটা চণ্ডালের রাগ আগুনের মতো

জ্বলতে লাগল।

আমার মাথার মধ্যে একরাশ অবুঝ রক্ত ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। নিজের উপর আমার নিজের কোনো অধিকার থাকল না। বুলবুলির প্রতি সব ভালোবাসা, বুকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা নিজের উপরের সব গর্ব, সব মমত্ববোধ কর্পূরের মত উবে গেল।

আমি এই রেকর্ডটার মত নিজেকেও যদি ভেঙে, পদদলিত করে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারতাম, একমাত্র তবেই বোধহয় আমার এই জ্বালা নিভত। আমি এর আগে এমন অনুভূতির সম্মুখীন কখনও হইনি। এই ব্যর্থ, প্রতারিত, প্রত্যাখ্যাত আমিকে, আমি কখনও চিনতাম না। এ যে আমারই বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল, আমার মত নিরীহ, নির্বিরোধী, ভালো ভাবনা ও ভালোবাসার লোকের বুকেও যে এ-লোক অবলীলায় লুকিয়ে থাকে তা আমার তখনও জানা ছিল না। এই নতুন আমি-র প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখে আমি ভীষণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

এমন সময় প্রদীপ্ত ঘরে ঢুকল, ট্রেতে বসিয়ে দু'কাপ কফি নিয়ে।

ওব পিছনে পিছনে ওর বাবাব লাইব্রেরীর একজন বেয়ারা হাবমোনিয়ামটাকে নিয়ে ঢুকল।

ঘরময় ভাঙা রেকর্ডের টুকবো দেখে প্রদীপ্ত একবার অপাঙ্গে আমাব দিকে চাইল।

কফিব কাপ দুটো নামিয়ে বেখে, বেয়ারাকে চলে যেতে বলল হারমোনিয়মটা বেখে দিয়ে।

তারপর প্রদীপ্ত আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে কফির কাপটা হাতে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি যে জলজ্যান্ত ঘরেব মধ্যে আছি, আমি যে এমন দাহ্য ও জ্বলন্ত অবস্থায় আছি, এটা সে দেখেও-না-দেখে, আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, একদৃষ্টে জানালার বাইরে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে, যেন বহুদূর থেকে বলছে, এমনভাবে প্রদীপ্ত বলল, কফিটা খা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কফির কাপটা তুলে নিয়ে সোফায় গিয়ে বসেছি, এমন সময় বাইরে যেন কার হালকা জুতোর শব্দ শোনা গেল—তারপরই রুমার গলা পেলাম।

রুমা বলছে, প্রদীপ্তদা, আপনি কোথায়?

ডাকতে ডাকতে ঘরের পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই রুমার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। রুমা আমাকে দেখে যেন হঠাৎ নিভে গেল। বলল, তুমি?

তারপর যেন নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলল, ভাল আছ রাজাদা?

রুমার গলা শুনে প্রদীপ্ত মুখ ফেরাল।

রুমার দিকে ফিরে বলল, খুব ভাল আছে।

রুমার নজর ততক্ষণে মেঝের রেকর্ডের টুকরোগুলোয় পড়েছে। ও আশ্চর্য হয়ে রেকর্ডের কভারটা তুলে নিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, ওকি? কেন? কি হয়েছে রাজাদা?

প্রদীপ্ত বলল, রাজা পাগল হয়ে গেছে।

রুমা হঠাৎ হাসল।

হাসিতে কোনো শব্দ হলো না।

রুমা বলল, রাজাদা তো চিরদিনের পাগল। এটা কোনো নতুন কথা নয়। আমি ভাবলাম, কি না কি হলো বুঝি!

প্রদীপ্ত বলল, তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে রুমা। আমার এখন অনেক কাজ। আমি এখন একটু নীচে যাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ রাজার সঙ্গে একটু গল্প করো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি নীচে থেকে। আমার মাসীমারা সবাই এসেছেন।

আমি প্রদীপ্তর চোখের দিকে চেয়ে মিনতি করলাম। চোখ দিয়ে বললাম, প্রদীপ্ত তুই এখন যাস না।

কিন্তু প্রদীপ্ত জেনেশুনেই চলে গেল। ইচ্ছে করে চলে গেল।

ওর মুখ দেখে মনে হলো, আমার প্রতি ওর কোনো রকম প্রীতি নেই।

রুমা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ভাঙা রেকর্ডের টুকরোগুলো তুলছিল।

ওর গলার হারের লকেটটা শূন্যে ঝুলছিল। সুন্দর শ্বেতা পাখির মতো ওর দুটি পেলব বুকের একটুখানি দেখা যাচ্ছিল। দু' বুকের মধ্যের সুন্দর সুগন্ধি খাঁজ।

আমার হঠাৎ মনে হলো, আমি রুমার বুকে মুখ রেখে খুব জোরে কেঁদে উঠি। কোনো কথা না বলে শুধু কাঁদি। আমি জানি, আমি তা করলে রুমা ওর সান্ত্বনা ও সোয়াস্তির হাত দিয়ে আমার মাথার চুল এলোমেলো করে দেবে, আর অস্ফুটে বলবে, তুমি বড় ছেলেমানুষ রাজাদা, তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ।

রুমা রেকর্ডের টুকরোগুলো তার নরম লতানো হাতে করে তুলে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

রুমা বলল, তোমার কি হয়েছে রাজাদা?

তারপরই বলল, শোনো, এই শোনো, তুমি আমার সামনে কখনও এমন মুখ করে থেকো না। এমন মুখ করে এসো না। তুমি বিশ্বাস করো, আমার বড় কষ্ট হয়। আমার বুকের মধ্যে যে কি কষ্ট হয়, তুমি কখনও তা জানতে পারবে না। প্লিজ, রাজাদা, প্লিজ, কথা বলো।

আমি তবুও চুপ করে থাকলাম।

রুমা বলল, কথা বলবে না? আমি তাহলে চলে যাই? যাবো?

আমি বললাম, বোসো। যেও না।

তবে কথা বলো? আমাকে বলো কি হয়েছে! নির্দ্বিধায় বলো। আমি তোমার জন্যে কিছু, কোনো কিছু করতে পারলে, যদি করতে পারি তো আমার বড় ভাল লাগবে। বিনিময়ে তোমার

কাছ থেকে কিছুই চাই না আমি। বিশ্বাস করো, কিছুই চাই না। আমার সঙ্গে অন্য দশটা সাধারণ মেয়ের কোনো মিল নেই। তুমি তা বোঝ না রাজাদা? আমি যদি সাধারণ হতাম তবে কি তোমাকে এমন করে বোকার মত ভালবেসে মরতাম?

আমি বললাম, আমার কিছু বলার নেই রুমা। তোমাকে কিছুই বলার নেই।

রুমা বলল, বুলবুলি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? তোমাকে কষ্ট দিয়েছে? বলো তো আমি বুলবুলিকে এক্ষুনি ফোন করে বলছি।

আমি বললাম, না। ঐ নাম তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। বুলবুলির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

রুমা হাসল। বলল, নেই বুঝি?

তারপরই বলল, তুমি একটা পাগল, সত্যিই পাগল। তুমি নিজেকেই বোঝ না, তুমি অন্যকে বুঝবে কি করে? বুলবুলি যে তোমাকে কি করে সামলাবে জানি না। তোমাকে সামলে রাখা ওর মত ঠাণ্ডা মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি বললাম, রুমা, অন্য কথা বলো।

কি কথা বলব? তুমি বলো।

চলো এখান থেকে আমরা চলে যাই। প্রদীপ্ত এখন ব্যস্ত আছে; ব্যস্ত থাকবে।

কোথায়? অবাক হয়ে রুমা বলল।

চলো যেখানে খুশী।

রুমা হাসল। বলল, সেই ভালো।

তারপর একটু থেমে আবার বলল, শুধু আজ নয়, যখনই তোমাকে পাগলামিতে পাবে, সেদিন যেদিনই হোক, তুমি সব সময় আমার কাছে চলে এসো। আমি যেখানেই থাকি না কেন। একথা তুমি হয়ত স্বীকার করবে না যে, তোমাকে আমি যতটা বুঝেছি, তোমার মাও ততটা বোঝেননি। তুমি আসবে, তারপর

তোমার পাগলামি থেমে গেলে, যার কাছ থেকে এসেছিলে তার কাছে আবার ফিরে যাবে। তোমার উপর কোনো রকম দাবী থাকবে না আমার। তবু, শুধু এসো। মাঝে মাঝে এসো। তোমাকে যেন দেখতে পাই মাঝে মাঝে।

প্রদীপ্তর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় প্রদীপ্তকে বলে গেলাম। আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে বেরোতে দেখে প্রদীপ্ত খুশী হলো।

হাসিমুখে প্রদীপ্ত বলল, আয়। আবার আসিস। কাজের দিন সকাল থেকে আসিস কিন্তু। তারপর রুমাকে বলল, তুমি তো আসবেই।

রুমাদের মেরুনরঙা বড় ওলডস্‌-মোবাইল গাড়িতে উর্দিপরা ড্রাইভার বসেছিল।

ড্রাইভার দরজা খুলল। রুমা বলল, তুমি আগে ওঠো।

আমি উঠে বাঁদিকে বসলাম।

রুমা তারপর উঠল।

রুমা ড্রাইভারকে বলল, ক্লাবমে চলো।

ড্রাইভার বলল, কওন্‌ ক্লাব দিদি?

রুমা বলল, সুইমিং ক্লাব।

আমি বললাম, বাড়ি যাবে না?

রুমা বলল, না। বাড়িতে বাবার অনেক বন্ধুরা আজ খাবেন। ককটেল্‌ আছে। অনেক লোক।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই রুমা আমার ডান হাতটা তুলে নিয়ে ওর কোলে রাখল।

ও একটা সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছিল। কমলা পাড়। কমলা রঙ ব্লাউজ।

আমার হাতটা ওর দু-হাত দিয়ে ও ধরে রইল। ফিসফিসে গলায় বলল, আপত্তি?

আমি কথা বললাম না। রুমার হাতে আলতো করে একটু

চাপ দিলাম।

সুইমিং ক্লাবে পৌঁছে, গেস্ট বুকে সই করে টাকা দিয়ে আমাকে নিয়ে বড় সুইমিং পুলের পাশে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসল ও।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার বেগুনী, লাল ও হলুদ ফুলগুলো জলে উড়ে এসে পড়েছিল। ঢেউয়ে দোল খাচ্ছিল। নীল জলের উপর ফ্লাডলাইটের আলো পড়েছিল। সাহেব-মেমরা সাঁতার কাটছিল।

চারটে দারুণ ফিগারের আমেরিকান মেয়ে বিকিনি পরে পুলের মধ্যে কাঠের চাকাটায় চিত হয়ে শুয়েছিল।

একজন ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িওয়ালা ইটালিয়ান ছেলে জলে দাঁড়িয়ে চাকাটা ঘোরাচ্ছিল।

মেয়েগুলো শুয়ে শুয়ে ন্যাকামি করে আঁউ আঁউ শব্দ করছিল।

রুমা বলল, কি খাবে!

বললাম, কিছু না।

রুমা বলল, কিছু খাও।

তারপর বেয়ারাকে ডেকে ফিসফিঙ্গার উইথ টার্টার সস্ অর্ডার করল। সঙ্গে ফ্রেশ লাইম উইথ সোডা।

রুমা অনুনয় করে বলল, কথা বলো। রাজাদা, প্লিজ কথা বলো।

আমি চুপ করে ছিলাম।

রুমা আবার বলল, কথা না বললে ভাল হবে না বলছি!

তারপর অনেকক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে থেকে বলল, জানো রাজাদা, আমি আর বেশীদিন তোমাকে জ্বালাব না। আমি নান্ হয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, বাজে কথা বোলো না। সন্ন্যাসিনী হবে তুমি!

ও বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার মধ্যে গৃহীর লক্ষণ তুমি এমন কি দেখলে যে, আমি সন্ন্যাসিনী হতে পারব না? সত্যি

সত্যিই আমি ক্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছি, নান্ হবার জন্যে। দেখো, বিশ্বাস না হলে দাদাকে জিগ্গেস করো, বাবা-মাকে জিগ্গেস কোরো।

ওঁরা তোমাকে হতে দিলে তো? আমি বললাম।

আমার গলাটা বোধহয় অসহায় অপরাধীর মত শোনাল।

কেন দেবেন না? আমার জীবন আমার। তা নিয়ে আমার যা-খুশী করার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু কেন? হবে কেন? কার উপরে অভিমান করে হবে?

এমনিই। আমার নান্দের জীবন ছোটবেলা থেকেই ভাল লাগে। ওঁদের পোশাক থেকে আরম্ভ করে সব-কিছু। ওঁদের সকাল থেকে রাত অবধি এমনই কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয় যে, ওঁদের ব্যক্তিগত সুখঃদুঃখের কথা একবারও মনে আসে না। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার মত এত ভাল প্রফেশান কিছু নেই।

লোকের সেবা করব, পীড়িতকে দেখব, নিজেকে সকলের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দেবো। তখন মনে হবে, আমাকে ভেঙে ভেঙে অপরিচিত অনাত্মীয়দের দেবার জন্যেই বুঝি আমি এসেছিলাম। একদিন এমনি করে হয়ত ভুলে যাব যে, আমার নিজের কিছু পাওয়ার ছিল কারো কাছে। একদিন এমনি করে নিজেকেই ভুলে যাব।

তারপর আরও বলল, জানো রাজাদা, জীবনে যখন পুরোপুরি-ভাবে নিজেকে এবং অন্য কাউকে পাওয়া হলো না, তখন নিজেকে অখণ্ড রেখে লাভ নেই। নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে দেওয়াই ভাল। তাতে আমারও লাভ, যাদের তা দেবো, তাদেরও। আমার কোনো অখণ্ড সত্তা থাকবে না।

আমি বললাম, অত সোজা নয়। তুমি যেভাবে মানুষ হয়েছ, পারবেই না অমন কষ্ট করতে। ভাবো বুঝি সোজা?

পারব না? বলে রুমা এক অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল,

পারব না কেন ? জন্ম থেকে বড়লোকদের মধ্যে থেকেছি, বড়লোকের মেয়ে হিসেবে মানুষ হয়েছি এবং সে জন্যেই বড়লোকী বা আরামের উপর আমার কোনো মোহ নেই। যারা বড়লোক নয়, অথচ যাদের বড়লোক হবার খুব ইচ্ছা, তারাই হয়ত বড়লোকীর বহিরঙ্গ রূপের দিকটাই বড় করে জানে। তারা অন্তরঙ্গ রূপটার খোঁজ রাখে না। সত্যিকারের যে মানুষ, সে মানুষই থাকে, সব অবস্থাতেই থাকে। আরাম, অবসর বা বিলাস কিছুতেই তার ভিতরটাতে মরচে ধরাতে পারে না। যারা মানুষ নয়, তাদের মধ্যেই ঘুণ ধরে, মধ্যের সার পদার্থটি ছিল না বলে তাদের থাকে না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার তো মনে হয়, আমি সবই পারব। আমার একটুও কষ্ট হবে না। শারীরিক কষ্টটা আবার কষ্ট নাকি ?

আমি বললাম, তোমাকে আমি তা হতে দেবো না।

রুমা খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর গালে টোল পড়ল। আলোর মধ্যে বসে ওকে দেবীর মত দেখাচ্ছিল।

ও বলল, ঈস্, ভারী তো আমার গার্জেন এসেছেন ? আমার কষ্টের কথা ভেবে তো ঘুম হচ্ছে না ?

পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে রুমা বলল, যে কষ্টটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটাই বুঝি কষ্ট, একমাত্র সেটাই চোখে পড়ে, আর যে কষ্ট দেখা যায় না বা বোঝা যায় না, সেটা বুঝি কিছু নয় ?

আমি কথা বললাম না। চুপ করে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর বললাম, জানি না রুমা।

রুমা ঝগড়ার গলায় বলল, জানো না তো তর্ক কোরো না আমার সঙ্গে। আমি যা করব ঠিক করেছি, তা করবই। কারো কথাই আমি শুনব না।

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল।

রুমা বলল, খাও।

একটু পরে বলল, খুব ভাল লাগল জানো, আজকে অনেকদিন

পর। তোমার সঙ্গে বেশ অনেকক্ষণ কাটানো গেল। জানো, আমার ট্রেনিং-এর পর কোথায় পোস্টিং হবে ?

কোথায় ?

রাঁচী থেকে পনেরো-ষোলো মাইল দূরে মান্দার বলে একটা জায়গায় আমেরিকান মিশান হস্‌পিটালে। তুমি গেছ কখনও ?

না। যাইনি।

যদি ও-পথে কখনও যাও, যেতে তো পারো বেড়াতে, নেতারহাট কি কোথাও, দেখা করে যেও আমার সঙ্গে। আমার খুব ভাল লাগবে। বুলবুলিকেও নিয়ে এসো।

আমি রেগে উঠলাম। বললাম, আবার ঐ নাম !

রুমা হাসল। বলল, এটা তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে। পাগল-দেরও লুসিড্ ইন্টাবভ্যাল থাকে। তারপরই বলল, কোনো ভয় নেই রাজাদা, তুমি যাকে এমন করে চাও, সে কি তোমাকে ফেরাতে পারে ? তুমি দেখো আমি যা বলছি তা ঠিক কিনা। মিথ্যেই রেকর্ডটা ভাঙলে। বলে ও এক অদ্ভুত হাসি হাসল।

খাওয়া-দাওয়ার পর রুমা বলল, চলো, এবার উঠি। বাড়ি গিয়ে মাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

রুমা বলেছিল ওর গাড়ি নিয়েই বাড়ি অবধি যেতে।

কিন্তু ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে, বাস ধরব বলে আমি নেমে গেছিলাম গাড়ি থেকে।

বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়েছিলাম।

রুমা অনেকক্ষণ অবধি গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে চেয়েছিল।

তারপর এক সময় গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা তীব্র অপরাধবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে মর্মান্তিকভাবে পীড়িত করে ফেলল।

রুমার কাছে নিজেকে বড় ছোট, স্বার্থপর ও অকিঞ্চিৎকর

বলে মনে হলো।

আমি মাথা হেঁট করে বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাস আসছিল না।

আকাশে মেঘ করেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। খড়কুটো ধুলো-বালি উড়িয়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হলো, আজ আমার জন্যে কোনো বাসই আসবে না। সমস্ত রুটের বাসই বাতিল করে দিয়েছেন কোনো শক্তিমান কেউ, যাতে আমি কোথাও কখনও না যেতে পারি ; কোনো গন্তব্যেই যাতে পৌছতে না পারি।

॥ ১১ ॥

অফিসে বসে এক ফার্মের গুড্উইলের ভ্যালুয়েশান করছিলাম, এমন সময় ফোনটা বাজল।

অপারেটার বলল, আপনাকে একটি মেয়ে ফোন করছেন।

আমি যেন খুবই বিরক্ত হয়েছি এমন গলায় বললাম, নাম কি?

নাম বলছেন, দীপা।

আমি বললাম, ইয়েস্।

ওপাশ থেকে দীপা বলল, রাজাদা!

আমি বললাম, বলছি।

আমি দীপা বলছি।

বলো। কি ব্যাপার!

দীপা হাসল একবার। তারপর বলল, আপনি বুলবুলিদিকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন?

মনে মনে ভীষণ চটে গেলাম। মনে মনেই বললাম, হোপলেস্। চিঠি দিয়েছি তো কি? সে চিঠির কথা ওকেও কি বলতে হবে? আরো কতজনকে বলেছে তা কে জানে?

বললাম, হ্যাঁ দিয়েছিলাম।

বুলবুলিদি বলতে বলল যে, বুলবুলিদি ভাল চিঠি লিখতে পারে না বলে চিঠি লেখেনি।

বুঝলাম! আমি বললাম।

ও আবার বলল, বুলবুলিদি বলতে বলল যে, পরশুদিন ওর রেডিও প্রোগ্রাম আছে; ও ওখানে যাবে রাত সাড়ে সাতটায়, আপনি কি ওর সঙ্গে ওখানে দেখা করতে পারবেন?

আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে

আসতে চাইল।

বাঁ হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে বললাম, পরশুদিন আমার অনেক কাজ। এক্ষুনি বলতে পারছি না। ভেবে দেখব।

তারপর বললাম, তুমি কাল এই সময় আরেকবার ফোন কোরো। যেতে পারব কি না জানাব।

ও বলল, আচ্ছা। তারপর বলল, আসবেন কিন্তু। বুলবুলিদি বলেছে ব্যাপারটা খুব জরুরী।

বললাম, তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কাজ আছে। বলো যে খুব চেষ্টা করব।

তারপর দীপা আবার বলল, আপনি ভাল আছেন?

হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ?

ভাল। ছাড়ছি, কেমন?

আচ্ছা।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

এক গ্লাস জল খেলাম। তারপর নিজেকে বললাম, কেমন দিলাম? কাজ আছে না ছাই! তবে সেও ভেবে মরুক। আমাকে যেমন একদিন ভাবিয়ে মেরেছে। সেও একদিন তেমন করে নরকযন্ত্রণা পাক! সাত-সাতদিন একেবারে চুপ। কি রকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোক যে সে! ভেবেই পেলাম না।

আবার মনোযোগ দিয়ে গুড্উইল ভ্যালুয়েশান করতে লাগলাম। আমার এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো লোকের প্রতি, একজনের প্রতিও কোনো ব্যাড-উইল নেই। সকলের প্রতিই আমার গুডউইল। আমি এই মুহূর্তে আগা খান হয়ে গেছি! পৃথিবীর সব লোককে আমি আমার মনের যত সোনা আছে, সেই সোনায় ওজন করে তাদের দিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু কি আশ্চর্য দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মেয়ে সে! জীবনের একটা অন্যতম বড় সিদ্ধান্ত সে কিনা নিজে নিতে পারল না, মানে, জানাতে পারল না। চিঠিতে লিখতে পারলাম না তো একটা ফোন

করতে কি ছিল? এতই যদি লজ্জা তো আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে কি করে? আমি আদর করতে গেলে তো লজ্জায় মরেই যাবে সে।

এমন যে হতে পারে তা আমার ভাবনার বাইরে ছিল।

ষাট সেকেণ্ডে মিনিট, ষাট মিনিটে ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন। কিন্তু আমার মনে হলো, এক একটা দিনের এত লম্বা হওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবী বুঝি সূর্যকে এর চেয়ে অনেক কম সময়ে পরিক্রমা করতে পারত। এত বড় একটা চব্বিশ ঘণ্টার দিন করার কোনো মানেই হয় না।

তবুও, যত ভারীই হোক, সব দিনই কাটে এক সময়; কাটে সব রাত।

দেখতে দেখতে পরশু দিন এসে গেল।

সেদিন আমার সকাল থেকে খিদে ছিল না। দু-দু'বার গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে অফিসে পৌঁছলাম।

অফিসে সেদিন যে কাজ করেছিলাম, যে-সব ভাউচার দেখেছিলাম, তার মধ্যে কত যে ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেল তা এক ভগবানই জানেন।

যে পার্টনার এই ব্যালান্স সীট সই করবেন তার লাইসেন্স বাতিল হতে বাধ্য। কিন্তু কি করা যাবে—আমি নিজেও যে বাতিল হতে বসেছিলাম। বাতিল হতে হতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবার মুহূর্তে আমার সামনে একটা হাজারদুয়ারী বাড়ির সব ক'টা জানলা-দরজা খুলে গেল। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠল ঘরে ঘরে। কে যেন হংসধ্বনির সুর লাগিয়ে কোন স্নিগ্ধ সুখের বিধুর বেহালা বাজাতে লাগল।

এখন আমার অন্যের কথা ভাবার সময় নেই। জীবনের কোনো একটা সময়ে কারুরই স্বার্থপর হওয়া দোষের নয়, অন্যায়ের নয়।

নিজেকে তাই বোঝালাম।

অফিস থেকে ফিরে চানটান করে আলমারী খুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার বুলবুলির সঙ্গে অভিসার। জীবনের প্রথম অভিসার।

ভাল করে সেজে না গেলে সে ভাববে কি?

একটা ব্রিক-কালারের হাওয়াইয়ান-শার্ট বের করলাম। সঙ্গে সাদা কর্ডের একটা ট্রাউজার।

আমার ভাল জামা-কাপড় ছিল না, কারণ, কখনও আমি জামা-কাপড়ে বিশ্বাসী ছিলাম না। মনে করতাম, পুরুষ মানুষের পরিচয় তার গুণে, তার কাজের মধ্যে। তাকে মেয়েদের মত সাজলে খারাপ লাগে।

কিন্তু আজকের যে সাজ সে তো আমার জন্যে নয়; অন্য একজনের ভালো-লাগার জন্যে। তার জীবনে আমার এই আজকের চেহারাটাই আঁকা থাকবে চিরকাল, যতদিন সে বাঁচবে। যখন তার চুল পেকে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে, তখনও কোনোদিন পিছন ফিরে চাইলে সে দেখতে পাবে যে, ব্রিক-কালারের হাওয়াই-শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরা একটি অল্পবয়সী ছেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে পৃথিবীর সব প্রেম, সব বিস্ময়, সব ভালোবাসা নিয়ে তার দিকে সে তাকিয়ে আছে।

দীর্ঘ জীবনের আবিল আবর্তে, একঘেয়েমির নোনাজলে, ভুল বোঝাবুঝিতে অন্য সব কিছু হয়ত ঘোলা হয়ে যাবে, ফ্যাকাসে হয়ে যাবে একদিন, তবু যখনি আমার বুলবুলি পিছন ফিরে চাইবে—তার সমস্ত স্মৃতি জুড়ে, তার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ জুড়ে আমার এই আজকের শর্তহীন ভালোবাসার চেহারাটাই ফুটে উঠবে।

অন্য কেউ, অন্য কোনো বোধ, অন্য কোনো শক্তি আজকের এই আনন্দঘন সন্ধ্যার স্মৃতিকে কখনও ম্লান করতে পারবে না তার মনে। যেদিন আমার এই শরীর চিতায় ছাই হয়ে যাবে, সেদিনও না।

ঘড়ি দেখে সময় মত দু-নম্বর বাসে উঠে বসলাম।

আজকের এই বিশেষ দিনে বাবার কাছে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে একটা গাড়ির চাবি চাইতে পারতাম।

কিন্তু ইচ্ছে হলো না।

আজ তার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনে বাবার গাড়ি চড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাব এ আমার মনঃপূত হলো না। সে আমাকে, এই কাঙাল রাজাকে দেখুক আমার ধুলোমাখা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। আমার নিজের পটভূমি, আমার নিজের বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ সব সে স্বচ্ছভাবে দেখুক।

আমি তো নামজাদা অ্যাকাউন্ট্যান্ট ব্রজেশ রায়ের ছেলে হিসেবে তার কাছে যাচ্ছি না! আমি যে যাচ্ছি দেড়শ' টাকা মাইনে পাওয়া, মাথা-ভর্তি পাগলামির পোকাভরা একজন নিছক সাধারণ ছেলে হয়ে। সে আমাকে ভাল লাগে কি না দেখুক, আমাকে জানুক, আমার জন্যে সে তাকে সমস্ত শর্তহীনতায় উৎসর্গ করতে পারে কি না পারে, ভেবে নিক।

আমি তাকে কোনো বড় বড় বুলি বলিনি, বলবও না। কোনো মিথ্যা সম্মান বা বিত্তের লোভ তাকে দেখাব না। আজ আমি যা, আমি তা-ই।

কখনও কোনোদিন যদি নিজের দাবীতে বড় হই, তখন তো সে আমার পাশে থাকবেই। আমার সম্মান, আমার সব তো তারই হবে।

কিন্তু আজ যে তাকে ভীষণ ভীষণ ভীষণভাবে ভালোবাসা ছাড়া দেখাবার মত, দেবার মত, তার মনে চমক তোলার মত আমার কিছুই নেই। আমি অমুকের ছেলে তমুক, আমি ফেলুড়ে, আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ওসব জেনেশুনেই ও আমার ভাঙা বাঁশের খাঁচায় আসুক। ওকে আমি সোনার খাঁচার লোভ দেখাব না।

বাসটা ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের সামনে এসে দাঁড়াল।

একটা ভিখারী মেয়ে রোজই এই স্টপেজে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চায়।

প্রতিদিনই সে জানালা দিয়ে হাত বাড়ালে বিরক্ত হই। হাত তোলা অবস্থায় তার ঝুলে-পড়া বুক, নোংরা বগল দেখা যায়, বমি বমি লাগে আমার। রোজই ওকে দেখলেই বমি বমি পায়।

আজও মেয়েটা এসে হাত বাড়াল।

যা কখনও কোনোদিনও হয়নি, আজ তাই হলো। তাকে দেখেই মনটা আমার সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে গেল।

আজ বিকেলে চান করবার সময় থেকেই মাথার মধ্যে মোহরদির গাওয়া মালকোষের সুর ঘুরপাক খাচ্ছিল। আনন্দধারা আজ ভুবনময় বয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি আজকে রাজা, আর ও বেচারী কেন ভিখিরিই থেকে যাবে? আজকে যে আমার ওর নোংরা হাতের আশীর্বাদেরও প্রয়োজন।

আমি হিপ্‌পকেট থেকে পার্স বের করে একটা টাকা দিলাম।

ও অবাক হয়ে রামের সুমতির কারণ খুঁজতে লাগল। ও এত অবাক হলো যে, আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া বা আমাকে উদ্দেশ্য করে হাত মাথায় ঠেকাতেও ভুলে গেল।

বাসটা ছেড়ে দিল।

মাথার মধ্যে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে জোর ভল্যুমে কোনো অদৃশ্য স্টিরিও রেকর্ড-প্লেয়ারে বাজতে লাগল।

ধর্মতলার মোড়ে বাস থেকে নেমে ইডেন গার্ডেনস্‌-এ রেডিও স্টেশনে হেঁটে গেলাম। মাসের শেষ। বেশী টাকা সঙ্গে নেই। ঠিক করেছিলাম, বুলবুলিকে সঙ্গে করে ওদের বাড়িতে পৌছে দেবো ট্যাক্সি করে।

ভিজিটার্স রুমে এসে বসলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওর প্রোগ্রাম শুরু হতে এখনও মিনিট পাঁচেক দেরি আছে।

তখন সমস্ত প্রোগ্রামই লাইফ-ব্রডকাস্ট হতো, এখনকার মত টেপ্ করার বন্দোবস্ত ছিল না তখন। ও নিশ্চয় স্টুডিওতে

চলে গেছে।

আমি বার বার ঘড়ি দেখছিলাম।

কে একজন কি গান গাইছিলেন। ভিজিটার্স রুমের রেডিওটা এত জোরে বাজছিল যে কানে লাগছিল।

ঐ গান শেষ হতে না হতে, বুলবুলির নাম বললেন অ্যানাউন্সার।

বুলবুলি প্রথমে গাইল,

"ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কী তোমার চাই ;
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি,
চলেছ কী কাতর গান গাই' !"

সেই গান শেষ হলে গাইল—

"তোমায় নতুন করে পাব ব'লে
হারাই ক্ষণে-ক্ষণ,
ও মোর ভালবাসার ধন।"

পৃথিবীর কোনো ভি-আই-পিও আজ অবধি বোধহয় এতখানি ইম্পরট্যান্স পাননি, আজ আমি যতখানি পেলাম।

আজকের গান ও নিজে বেছেছিল কি না জানি না। নিশ্চয়ই নিজেই বেছেছিল। নইলে আমি যখন ভিজিটার্স রুমে তীর্থের কাকের মত ওরই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি, ঠিক সেই সময়ই বিশেষ করে এ দু'খানি গানই ও গাইত না!

গান শেষ হলে, আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলাম।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসে, ডিউটি-রুম থেকে চেক নিয়ে এখানে আসতে ওর কতখানি সময় লাগতে পারে মনে মনে তার হিসেব করছিলাম।

আমি এতক্ষণ হাঁ করে দরজার দিকেই তাকিয়েছিলাম।

পরক্ষণেই মনে হলো, ও এসে ওর প্রতীক্ষায় হাঁ করে আমাকে চেয়ে থাকতে দেখলে ওর গর্ব আরো বেড়ে যাবে। তাই আমি

মুখ ঘুরিয়ে যেদিকে ঘরের কোণায় রেডিও সেটটা রাখা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। যেন তাৎক্ষণিক আধুনিক গানে আমার মন একেবারে ডুবে আছে ; এমন ভাব করে।

ঘরে আর কেউ ছিল না তখন।

হঠাৎ চোখের কোণে দেখতে পেলাম দরজায় একটি ছায়া পড়েছে। আমি তবুও তাকালাম না।

রিনরিনে মিষ্টি গলায় কে যেন বলল, এই যে! আমি এসেছি।

আমার সমস্ত মস্তিষ্কময় সেই রিনরিনে মিষ্টি গলা বাজতে লাগল, "আমি এসেছি ; আমি এসেছি, আমি এসেছি।"

আমি মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়েই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

দরজায় আমার এত আনন্দের, এত কষ্টের, এত কল্পনার বুলবুলি দাঁড়িয়েছিল।

হাতী-হাতী কাজ করা বেগুনী আর কালোতে মেশা একটা সম্বলপুরী সিল্কের শাড়ি পরেছিল সে, গায়ে কালো সিল্কের ব্লাউজ। হাতে চামড়া-বাঁধানো একটা গানের খাতা। তার সঙ্গে বুকের কাছে ধরা একটা গীতবিতান। গ্রীবার পেছনে একটা মস্ত খোঁপা হেলানো রয়েছে। পায়ে কালো চটি। কপালে ম্যাড্রাসী সিঁদুরের বেগুনী টিপ।

বুলবুলি দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাসলাম। তারপর ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

সেই মুহূর্তে স্টেজে উঠলে যেমন আমার বরাবর হয়, সেই ভয় আর ভাবনাটা মাথার মধ্যে ফিরে এল।

হাত দুটো কোথায় রাখব?

আমরা দু'জনে কেউ কোনো কথা বললাম না অনেকক্ষণ।

রেডিও স্টেশনের লম্বা করিডোর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

আমরা যে কোনোদিনও পাশাপাশি হব, এমন পাশাপাশি হাঁটতে পারব একে অন্যের একান্ত কাছের মানুষ হয়ে, তা বোধহয় ওর কাছে এবং আমার কাছেও অবিশ্বাস্য ছিল।

আমি যেন কেমন বোকার মতই বললাম, কোথায় যাওয়া হবে?

ও তোতলামি করে বলল, কো-কোথাও গিয়ে বসলে হয়!

কোথায়? আমি বললাম, নার্ভাসনেস কাটিয়ে উঠে।

ও আবার তুতলে বলল, যে-যেখানে হয়!

আমরা গঙ্গার ধারের দিকে হেঁটে গিয়ে মাঠের মধ্যে বসলাম।

আমি বললাম, বলো।

কি বলব?

আমার চিঠির উত্তর তো দাওনি এখনও।

ও মুখ নীচু করে ছিল।

এক পলকের জন্যে মুখ তুলে বলল, উত্তরটা কি আমার বলার উপর নির্ভর করেছিল? উত্তর কি আপনি জানতেন না?

ওর সপ্রতিভতা দেখে আমার নিজেকে অপ্রতিভ লাগল।

বললাম, না। তবুও এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তুমি কি ভাল করে ভেবেছ? এ ক'দিনে কি যথেষ্ট ভাবার সময় পেয়েছ? যদি না পেয়ে থাকো আরো সময় নাও। তাড়াতাড়ি কোরো না। যতদিন খুশী সময় নাও।

কথাটা বলে ফেলেই, মনে মনে নিজেকে নিজে বললাম, ঈস্, ব্যাটা যেন নবাবপুত্তুর। এ ক'দিনেই তো খাবি খেয়ে মরছিলে, এখন ভারী সময় দেনেওয়ালা হয়ে গেছ!

ও বলল, ক'দিনমাত্র কেন? অনেক আগে থেকেই ভেবেছি। আপনার চিঠি পাবার অনেক আগেই ভাবাভাবি শেষ হয়ে গেছিল।

আমি আনন্দে ঝলমল করে উঠলাম, বললাম, তাহলে আমাকে

এতদিন এত কষ্ট দিলে কেন? আমাকে জানালে না কেন?

ও অবাক হলো। মুখ তুলে বলল, বাঃ, আমি কি জানাব? আমি তো মেয়ে। পুরুষ হয়েও আপনার যদি এত সংকোচ, এত লজ্জা তো আমার বুঝি লজ্জা করত না? আপনি নিজে কবে বলবেন, সেই অপেক্ষায় ছিলাম।

ও! বললাম আমি।

তারপর বললাম, বাসন মেজে খেতে পারবে তো প্রয়োজন হলে?

ও হাসল; বলল, পারব। সত্যিই বলছি, পারব। দেখবেন, পারি কি না! প্রয়োজন হলে সব পারব।

বললাম, আমি যদি পরীক্ষা পাস না করতে পারি?

ও কথাটাকে আমলই দিল না। শুধু বলল, পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন।

তারপরই বলল, আপনাকে খুব বড় হতে হবে কিন্তু। আমার যেন খুব গর্ব হয়, আপনার জন্যে।

আমি বললাম, জানি না। শুধু কথা দিতে পারি যে, চেষ্টা করব।

তারপর বললাম, তুমি তো এখনই বড়।

ও প্রতিবাদ করল। বলল, কী যে বলেন! এখনও কত বছর গান শিখতে হবে। এখন তো সবে শিখছি।

আমি বললাম, মোটেই না। তুমি এখনই বেশ বড়।

ও বলল, ভুল। কোনো কিছুই তাড়াতাড়ি করলে হয় না।

তারপর বলল, এখনও গানের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি আমাকে গান গাইতে দেবেন তো?

আমি অবাক হলাম; বললাম, নিশ্চয়ই। গান গাইতে দেবো না তোমাকে?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তুমি কিন্তু আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলেকে বিয়ে করতে পারতে। সেদিন বৌদির কাছে

শুনছিলাম, তোমাকে পাবার জন্যে কোন্ রাজপুত্র নাকি আসছেন স্টেটস্ থেকে মেটালার্জিতে ডক্টরেট করে? সেরকম নাকি ছেলে আর হয় না? সত্যি?

সত্যি। ও বলল।

আমি বললাম, কি সত্যি?

ও বলল, আসছে যে সেটা সত্যি। এবং ছেলেও খুব ভাল।

তোমার জন্যেই আসছে, না?

সেটাও হয়ত সত্যি।

তবে? তার জাহাজ তো বম্বেতে পৌঁছল বলে!

ও বলল, পৌঁছবে না।

আমি বললাম, তার মানে?

জাহাজটা ডুবে যাবে। ভরাডুবি হবে, যে আসছে তার। বলেই বুলবুলি মুখ তুলে হাসল।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, আমি কিন্তু খুব রাগী। জানো তো?

ও হাসল। বলল, ছেলেদের একটু রাগ থাকা ভাল। নইলে ছেলে-ছেলে মনে হয় না।

তারপর বলল, আমার খুব কম লোককেই ভাল লাগে। আমার বাবা বেঁচে থাকতে আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন, খুকীর যেমন নাক উঁচু, ওর কাউকেই যখন পছন্দ নয়, তখন ওর বিয়ে দেবো না।

তোমার বাবা বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসতেন?

খু—উ—ব।

বলতেই বুলবুলির গলা ভারী হয়ে এল। বলল, বাবার মত ভালবাসতে খুব কম লোক জানতেন। ওরকম করে সকলকে ভালোবাসতে আমি কাউকে দেখিনি। বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তো সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন।

সেই মুহূর্তে ময়দানের অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে বুলবুলির

দিকে চেয়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

মনে মনে বললাম, বুলবুলি, তুমি দেখো, তোমাকে আমি এত আদর করব, এত ভালোবাসব যে, বাবার কথা মনে পড়বে তোমার। তুমি দেখো, তোমাকে আমি তোমার বাবার মত করে ভালবাসব। তোমাকে এতটুকু কষ্ট দেবো না, আঁচড় লাগতে দেবো না তোমার গায়ে; তোমাকে এত আরামে রাখব, তুমি দেখো।

কিন্তু মুখে কিছু বলা হলো না।

আমি চুপ করে বুলবুলির দিকে চেয়ে রইলাম।

ও হঠাৎ বলল, এখন উঠলে হয় না? জায়গাটা বড় নির্জন।

বললাম, উঠবে? আচ্ছা চলো আমরা পার্ক স্ট্রীটে যাই। সেখানে 'ম্যাগনোলিয়া'য় কিছু খেয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো। কেমন?

বুলবুলি বলল, আপনি যা বলবেন।

একটা ট্যাক্সি ধরলাম।

বললাম, ওঠো।

ও বলল, আপনি আগে উঠুন।

ম্যাগনোলিয়ার সামনে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে ওকে নিয়ে ভিতরে গেলাম।

কোণার দিকে নিরিবিলি জায়গা দেখে বসলাম।

আমি বললাম, কি খাবে বলো?

ও বলল, আমি শুধু একটা ফ্রেশ-লাইম খাব।

আর কিছু না?

না।

কেন?

খেতে ইচ্ছে করছে না।

কেন ইচ্ছে করছে না?

বুলবুলি চোখ নামিয়ে নিল। বলল, জানি না। এমনিই।

অন্ধকার থেকে এসে আলোয়-ভরা রেস্তোরাঁয় সামনাসামনি

বসে আমারই একান্ত, আমার বুলবুলিকে ভাল করে দেখলাম।

কী ভালো যে দেখতে বুলবুলি! কী দারুণ ফিগার; কী সুন্দর করে সেজেছে!

কত বড় হয়ে গেছে ও এক বছরে।

এই তন্বী সুগন্ধি যুবতীর সঙ্গে কোনো মিল নেই সেই রিহার্সালে প্রথম দেখা ছোট ছিপছিপে মেয়েটির।

ফ্রেশ লাইম দিয়ে গেল বেয়ারা ওর জন্যে। আমার জন্যে কফি।

ফ্রেশ লাইমের পাশে একটা স্ট্র-ভর্তি কাগজের বাক্স বসিয়ে দিয়ে গেল।

বুলবুলি একটা স্ট্র বের করে ফ্রেশ লাইমে ডুবিয়ে চুমুক দিতে যেতেই স্ট্রটা ভেঙে গেল।

আরেকটা স্ট্র নিল ও।

আমি মুখ নীচু করে কফিতে চুমুক দিলাম।

ও নিজে হাতে, কাঁকন বাজিয়ে, কফি ঢেলে দুধ ও চিনি মিশিয়ে কফি বানিয়ে দিয়েছিল।

একটু পরই হুঁশ হলো, ও প্রায় দশ-বারোটা স্ট্র ভেঙে ফেলেছে।

তখনও ক্রমান্বয়ে স্ট্র ভাঙছে; মোটে ফ্রেশ লাইমে চুমুকই দিতে পারছে না।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কি হলো?

বুলবুলি খুব লজ্জা পেয়ে বলল, ভেঙে যাচ্ছে।

কেন? আশ্চর্য হয়ে বললাম আমি।

আবার শুধোলাম, এতগুলো ভাঙল কি করে?

পরক্ষণেই দেখি, বুলবুলির ডান হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে।

আমি বললাম, ও কি? তোমার কি হয়েছে? তোমার হাত কাঁপছে কেন? তোমার হাত কি কাঁপে?

না তো! কখনও তো কাঁপে না এমন। জানি না, কি হয়েছে!

লজ্জা পেয়ে বুলবুলি বলল।

তারপর আতঙ্কগ্রস্ত গলায় বলল, এটা কি কোনো অসুখ?

আমি বুলবুলির চোখের দিকে অপলক চেয়ে রইলাম।

একটা আশ্চর্য নরম ধরা-পড়া সমর্পণী হাসি ওর মুখময় ছড়িয়ে গেল।

ও বলল, বিশ্বাস করুন, সত্যিই জানি না, কি হয়েছে আমার। এমন কখনও হয় না কিন্তু, কখনও হয়নি আগে, কোনোদিনও না।

আমার মুখেও এক দারুণ দারুণ দারুণ সুখের হাসি ফুটে উঠল।

আমি ওর চোখ থেকে চোখ সরালাম না।

ঐ আলোকিত স্বর্গে বসে, আমার প্রথম প্রেমিকা, আমার ভাবী স্ত্রীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে সেই উৎসারিত আনন্দের উষ্ণতার মধ্যে হঠাৎ এক দারুণ শীতার্ত ভয়ে আমার গা ছমছম করে উঠল।

আমার হঠাৎ মনে হলো, চিরদিন, আজীবন তোমাকে আজ যেমন করে ভালবাসি তেমন করে ভালবাসতে পারব তো? তুমি আমার সামনে বসে আজ যেমন করে সজনে পাতার মত ভালো-লাগায় কাঁপছ, চিরদিনই কি তেমন করে কাঁপবে তুমি, বুলবুলি? যদি না···। না যদি···।

বুলবুলি কথা বলছিল না কোনো।

আমার দিকে একদৃষ্টে এক আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ নরম চোখে ও চেয়েছিল।

যেমন চোখে কাউকে ভীষণ ভালোবেসে একমাত্র মেয়েরাই চাইতে পারে।

—